আদ্যাপীঠ প্রসঙ্গে
ভগবান রামকৃষ্ণের
আদেশবাণী



ব্রহ্মচারী জ্ঞানভাই
কর্তৃক প্রণীত

মূল্য পাঁচ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ
রুদ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬৮ মানিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ হইতে
ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন ভাই কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান :—
১। আদ্যাপীঠ ; দক্ষিণেশ্বর
পোঃ আরিয়াদহ ; ২৪ পরগণা
২। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং
১৩৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা

ভূমিকা

ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যে লীলা করিয়া গিয়াছেন সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল। তিনি অপ্রকট হইবার পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন, "বায়ুকোণে আমার আবার দেহ হবে;" "বত্রিশ বৎসর পরে আমি আবার আস্‌ব" ইত্যাদি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের এই পুনরাগমনের আশায় তাঁহার ভক্তগণের অনেকেই উদগ্রীব; বত্রিশ বৎসরের স্থলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইতে চলিল; কিন্তু তাঁহার পুনরাবির্ভাব কোথায় কি ভাবে হইল সে সন্ধান অদ্যাবধি সাধারণে না পাইলেও, তাঁহার কার্য্য নূতন ভাবে নূতন ধরণে দক্ষিণেশ্বরে এক নবীন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে একথা এদেশীয় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন।

দক্ষিণেশ্বরের এই নবীন অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ এই পুস্তিকায় বিবৃত হইতেছে; এতৎপ্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা ও কাহিনী বিবৃত হইবে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনেক স্থলে জড় বিজ্ঞানের শক্তি সাহায্যে উপলব্ধি হইবার নহে। বিজ্ঞান বা যুক্তিতর্কের সাহায্যে সাধারণ মানববুদ্ধিতে প্রতিফলিত সত্য ব্যতীত এমন বহু বৃহত্তর সত্য আছে যাহা কেবলমাত্র সাধনার অবস্থা বিশেষে মহাপুরুষগণের উপলব্ধি হয়। শাস্ত্রাদিতে উহাকে অপৌরুষেয় সত্য বলা হইয়া থাকে। জড়বিজ্ঞান এই সত্যের সন্ধান পায় নাই। পিপাসু সাধক বিশ্বাস ভক্তি সহকারে সাধু গুরুর নিকট এই সত্যের সন্ধান লইয়া লাভের আশায় গুরুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে ব্রতী হইয়া থাকেন এবং নিষ্ঠা সহকারে আচরণপূর্ব্বক সফলকাম হইয়া থাকেন।

আদ্যাপীঠ প্রসঙ্গে এই সত্যের সন্ধান আমরা শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতেই পাইতেছি। স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয়ের মধ্য দিয়াই এই সত্যের আলো ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদেশরূপে জীবজগতে প্রচার

হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী অপরিণতবুদ্ধি যুবক এই সত্য গ্রহণ করিতে না পারিলেও ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী জনসমাজ আশার আলো পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের নিকট এই আনন্দ সংবাদ পৌছাইতে হইবে; ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশবাণী অবিচারে প্রচার করিতে হইবে। আদেশ হইয়াছে, **বাংলায় এমন একটী জাগ্রত অনুষ্ঠান হইবে যেখানে ভাগ্যবান ভক্ত ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া দ্রষ্টারূপে জীবের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবে।** ঠাকুর আদেশ করিয়াছেন তাঁহার আট জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ও তাঁহার গতবারের আঠার জন ভক্ত এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য পুনরায় বাংলায় অবতীর্ণ হইতেছেন। এই সমস্ত ভক্তগণ যিনি যেখানে আছেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিবার জন্য, তাঁহাদের সুপ্ত শক্তি জাগরিত করিবার জন্য এবং আস্থাপীঠের সংস্রবে আসিয়া যাঁহাদের জীবন ধন্য হইবে তাঁহাদের নিকট এই বার্ত্তা পৌছাইয়া দিবার জন্যই এই পুস্তিকা প্রচারের আয়োজন। ফলাফল সমস্তই সেই কর্ম্মকর্ত্তার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।

এই পুস্তক প্রণয়ন ব্যাপারে আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে উপরি উক্ত উদ্দেশ্য লইয়াই ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বসু এম, বি, "আস্থাপীঠ প্রসঙ্গ" এবং "আদেশবাণী" নামে দুইখানি পুস্তিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শচীন্দ্র বাবু এই পুস্তকে আলোচ্য অনুষ্ঠানের সংস্রব পরিত্যাগ করায়, তাঁহার দ্বারা ঠাকুরের বাণী আপাততঃ প্রচার হইবার আর আশা নাই দেখিয়া অনুষ্ঠানের কর্ম্মী হিসাবে প্রয়োজনের অনুরোধে আমি এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছি। আস্থাপীঠের আদিপুরুষ শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের "স্বপ্নজীবন" হইতেই প্রধানতঃ বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই সঙ্কলনকার্য্য সমাধা করিয়াছি। ইহাতে পুস্তক প্রণয়নের কৃতিত্ব আমার কিছুই নাই। ইতি—

ঝুলনপূর্ণিমা
শ্রাবণ সংক্রান্তি; ১৩৩৯ } ব্রহ্মচারী জ্ঞানভাই

আদ্যাপীঠ প্রসঙ্গে ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশবাণী

আদ্যাপীঠ পরিচয়

আদ্যাপীঠ নবযুগের মহাতীর্থ। কালে এই তীর্থে দয়াময়ের অসীম দয়ার অতুল নিদর্শন লক্ষিত হইবে ইহাই ভগবানের আদেশ। অনুষ্ঠান হিসাবে বর্ত্তমানে ইহা শিশুমাত্র; শিশুর জন্মপত্রিকায় রাজ্যপরিচালন সম্ভাবনার উল্লেখ দেখিয়া যদি কেহ আজই তাহার রাজৈশ্বর্য্যের দাবী করেন তাহা হইলে উহা যেমন একটা ভ্রম হইবে সেইরূপ আদ্যাপীঠের শৈশব দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে তেমনই ভ্রম হইবে।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জীবের উদ্ধারকল্পে শ্রীশ্রী৺অন্নদা-ঠাকুর মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যে পবিত্র অনুষ্ঠানের অবতারণা করিয়াছেন উহাই আদ্যাপীঠ নামে সাধারণে পরিচিত। ভগবান রামকৃষ্ণদেব জীবদেহে দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে যেস্থানে লীলা করিয়া গিয়াছেন, রাণী ৺রাসমণির সেই কালীবাড়ীর অনতিদূরে গঙ্গাতীর হইতে প্রায় পাঁচ মিনিটের পথে চৌধুরীপাড়া দোলপিড়ীর নিকটেই

আদ্যাপীঠ অবস্থিত।* প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি বা পরবর্ত্তী রবিবারে আদ্যাপীঠের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্যামবাজার হইতে আদ্যাপীঠ পর্য্যন্ত বরাবর মোটরবাস যাতায়াত করে। সহস্র সহস্র লোক তীর্থদর্শনে গিয়া উৎসবানন্দে যোগ দিয়া থাকেন। উৎসবের সময় সর্ব্বসাধারণের দর্শন ও যোগদানের উপযোগী করিয়া পূজা পাঠ ও কীর্ত্তনাদির আয়োজন করা হইয়া থাকে। সমস্তদিবসব্যাপী ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন, লীলাভিনয় ও প্রসাদবিতরণ কোলাহলের সাত্ত্বিকভাবে ভক্তমাত্রেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন।

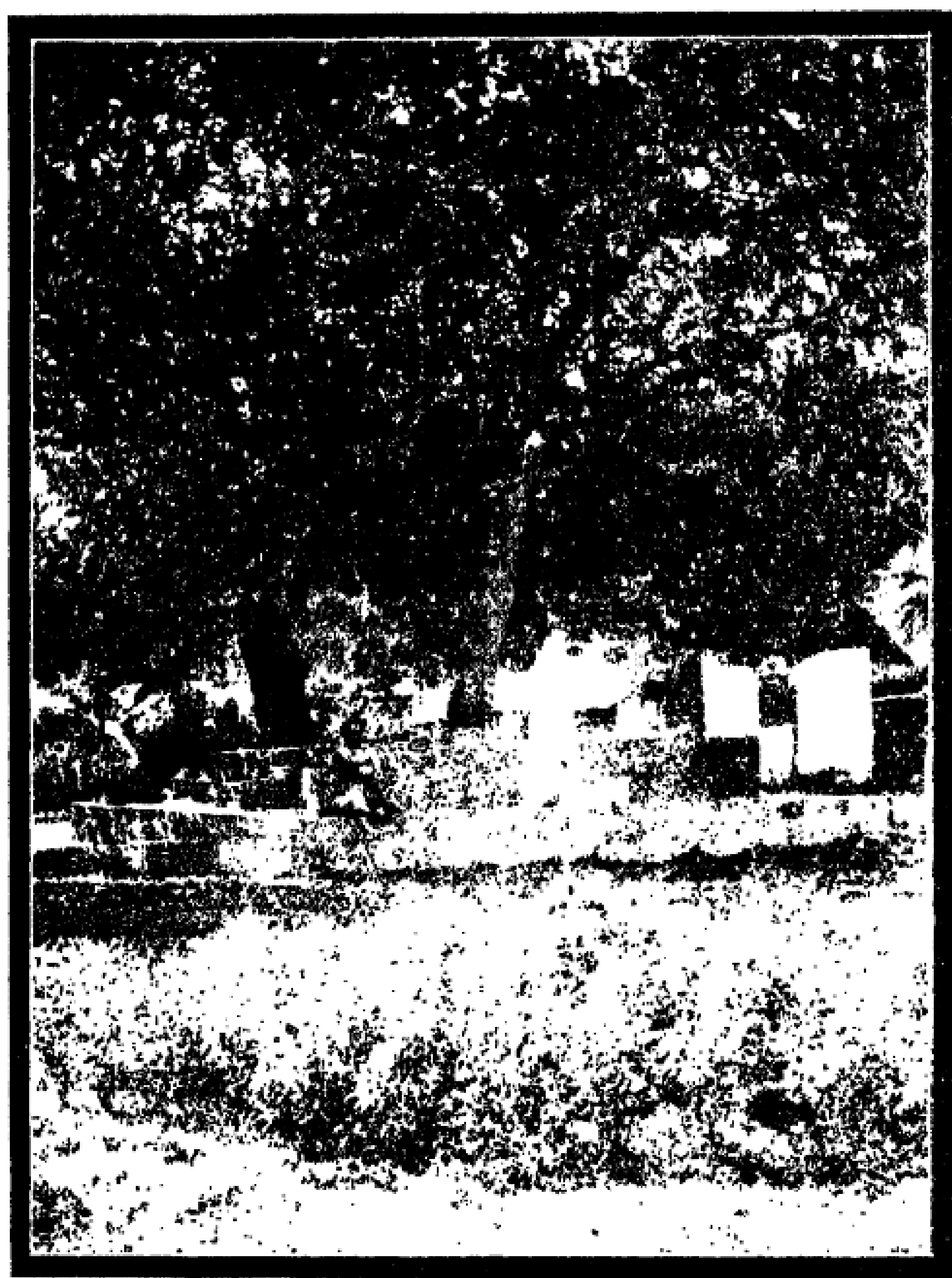
মঠপ্রাঙ্গণে বর্ত্তমানে ছয়টী শিবমন্দির ব্যতীত শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূর্ত্তি, শ্রীশ্রী৺আদ্যাশক্তিমূর্ত্তি ও প্রণবমধ্যস্থ শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সম্বলিত ৺মায়ের মন্দির, শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণজীর মন্দির এবং আরও দুইটী শিবমন্দির আছে। ছয়টী শিবমন্দির ব্যতীত অন্যান্য মন্দিরগুলি সাধারণ ঘরের মতই নির্ম্মিত। সুদৃশ্য মন্দিরগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান। প্রশস্ত চত্বর মন্দিরগুলির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দেবালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছে।

মন্দিরশ্রেণীর সম্মুখে প্রশস্ত ময়দান; উৎসব সময়ে এই ময়দানেই মণ্ডপাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে বামদিকে নির্জ্জনতাপ্রিয় সাধনাভিলাষী কর্ম্মীদিগের জন্য দুইটী কুঠিয়া আছে। কুঠিয়া অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে চত্বরবেষ্টিত

* কলিকাতা শ্যামবাজার হইতে মোটরবাসে আলমবাজার পৌঁছিলে পদব্রজে কালীবাড়ীর রাস্তা ধরিয়া ম্যাগাজিন রোড অবলম্বনে আদ্যাপীঠে আসিবার সাধারণ রাস্তা। তদ্ভিন্ন এদিকে ই, বি, আর, লাইনের বহু লোক বেলঘরিয়া ষ্টেশন হইয়াও আদ্যাপীঠ দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া থাকেন। গঙ্গার নূতন সেতু বালি ব্রিজ সম্প্রতি সাধারণের ব্যবহারে লাগিয়াছে; এখন বহু লোক পদব্রজে গঙ্গা পার হইয়াও আদ্যাপীঠে আসিয়া থাকেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে রেলষ্টেশন হইলে সাধারণের যাতায়াতের আরও সুবিধা হইবে।



আস্থাপীঠ



বেলতলা ও মন্দিরের ভিত্তিস্থান

একটী পুরাতন বেল ও কাঁঠাল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁধান বেলতলায় বসিয়া আদ্যাপীঠপ্রতিষ্ঠাতা আমাদের সেই প্রাণের ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। ইহারই পূর্ব্বদিকে আদ্যাপীঠের প্রধান কর্ম্ম ভগবানের আদিষ্ট মন্দির স্থাপন উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয় মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক জটাভার প্রোথিত করিয়া মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দির নির্ম্মাণই আদ্যাপীঠের ধ্যান জ্ঞান; আদ্যাপীঠের মূলমন্ত্র; আদ্যাপীঠের একমাত্র তপস্যা; আদ্যাপীঠ জানে এই মন্দির হইতেই ক্রমে সমস্ত হইবে। এই মন্দির সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী বিবরণে সবিশেষ আলোচনা করিব।

মঠপ্রাঙ্গণের উত্তরাংশে আদ্যাপীঠের সাধু ব্রহ্মচারী কর্ম্মীদিগের আবাস ও বালকদিগের জন্য একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আছে। কর্ম্মী আবাসে ঠাকুরের ছোট ঘরখানি তাঁহার পবিত্র স্মৃতি বুকে লইয়া তীর্থযাত্রী ভক্তদিগের ভাবের উদ্রেক করিতেছে। ইহারই সংলগ্ন বালকদিগের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আশ্রমবালকগণ উপযুক্ত গুরুর অধীনে আদর্শ শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী, তাহাদের আলাপ ব্যবহার, তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা দেখিয়া যাত্রিগণ পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

অতিথি অভ্যাগত তীর্থযাত্রী সকলের পরম শান্তির স্থান এই আদ্যাপীঠ। সাধু ব্রহ্মচারী সেবকগণ যথাসাধ্য অতিথিসেবা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী-দিগের প্রতি আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের আদেশ এই যে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি যেন কখনও বিমুখ না হয়। আদ্যাপীঠের সাধকগণ এই শিক্ষা তাঁহাদের সাধনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা, আদ্যাপীঠের পূজাপাঠ ভোগ আরতি এবং বালক ও বালিকা-দিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিচালন প্রভৃতি কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদেশবাণী প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই আদ্যাপীঠের

সাধকগণ ত্যাগের আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক ঠাকুরের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আদ্যাপীঠের এই সাধারণ পরিচয় দিয়া এক্ষণে আমরা এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আদ্যামূর্ত্তি প্রাপ্তি

আদ্যাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী৺আদ্যাশক্তি। ৺মায়ের আদেশেই এই পুণ্যক্ষেত্রের নাম হইয়াছে আদ্যাপীঠ। ভগবানের আদেশ অনুযায়ী আদ্যাপীঠে যে মন্দির নির্ম্মাণ চেষ্টা চলিতেছে সেই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলাভিষিক্তা মূর্ত্তি হইবে শ্রীশ্রী৺আদ্যাশক্তি শ্রীবিগ্রহ। এই আদ্যামূর্ত্তির এক সুন্দর ইতিহাস আছে।

আদ্যাপীঠের কর্ম্মভার পাইবার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশে কলিকাতা ইডেন গার্ডেনের ঝিল হইতে এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন; ইহাই শ্রীশ্রী৺আদ্যাশক্তিমূর্ত্তি। এক্ষণে এই আদ্যামূর্ত্তি প্রাপ্তির ঘটনা আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিব।

সে আজ প্রায় বিশ বৎসর হইতে চলিল; তখন বাংলা ১৩২১ সাল। আদ্যাপীঠপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় তখন কলিকাতাপ্রবাসী চট্টগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক মাত্র; বয়স তখন তাঁহার তেইশ চব্বিশের অধিক হইবে না। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৺সিদ্ধেশ্বর বসু মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় লইয়া তিনি ঝামাপুকুরে ৺রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটীতে আহার করিতেন এবং কলেজে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন। বসু মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থানকালে গৃহস্থের সহিত তাঁহার বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা হয় এবং কবিরাজী পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদেরই অর্থসাহায্যে ঔষধালয় খুলিয়া তিনি রীতিমত চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সম্পূর্ণ উদ্যোগ করিয়া বসেন।

পিতামাতার পদধূলি লইয়া শুভদিনে কার্য্য আরম্ভ করিবার অভিপ্রায়ে দেশে গিয়াছেন এমন সময়ে এক রাত্রে এক সন্ন্যাসী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ৺মায়ের এক মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, **"তুমি কলিকাতায় যাও, তোমায় এইটী দিব।"** বাড়ীর সকলে স্বপ্নকথা শুনিয়াও তাঁহাকে বাটীতে রাখিতেই চেষ্টা করিলেন; তখন আবার স্বপ্ন হইল, **"যদি কাল কলিকাতায় না যাও, মহা বিপদ ঘটিবে।"** পরদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি দেখিলেন সেই রাত্রে এক বিপদ ঘটিল; অপর বাড়ীর আগুন আসিয়া বাড়ীতে আগুন ধরিয়া গেল; পাড়াপড়শীর বিশেষ চেষ্টায় অন্যান্য ঘরগুলি রক্ষা পাইলেও বাড়ীর বৈঠকখানা ও গোয়ালঘরখানি পুড়িয়া গেল। তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় চিকিৎসালয়ের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলে প্রথম রাত্রেই সেই সাধু স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক গঙ্গা স্নান করিয়া আসিবার জন্য ঠাকুরমহাশয়কে আদেশ করেন। সে আদেশে কর্ণপাত না করায় সাধু যখন পুনরায় দ্বিতীয় দিন আবির্ভূত হইলেন তখন কটূক্তি করিয়া ঠাকুরমহাশয় তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সে সময় চৈত্রমাস; সেদিন সেই বাসন্তী সপ্তমীর রাত্রে তখন ভগবান রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে মস্তকমুণ্ডন ও গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। পরদিবস অষ্টমীর দিন স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী মুণ্ডন স্নানাদি সারিয়া ঠাকুর মহাশয় বিশুদ্ধ আহার ও বিশুদ্ধ শয্যা আশ্রয় করিয়া কাটাইলে রাত্রিশেষে পরমহংসদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আদেশ করিলেন, **"ইডেন গার্ডেনের যেখানে নারিকেল ও পাকুড় গাছ**

এক সঙ্গে উঠেছে, তার নীচে যে একটী মূর্ত্তি পাবে, তিন জন ভক্ত সঙ্গে করে সেখানি নিয়ে এস; মৌনাবলম্বন করে থেকো; আর যতদূর সম্ভব মূর্ত্তিখানি গোপন করে রেখো; তার পর যেমন যেমন আদেশ হয় সেই রকম করো।”

আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া ঠাকুরমহাশয় তাঁহার বন্ধু সেই গৃহস্থের অন্যতম সন্তান শচীনবাবুকে সমস্ত জানাইলেন। গৃহস্থের আশ্রিত শ্রীমান সত্যকিঙ্কর রায় নামক আর একটী যুবক এবং পাশের বাড়ীর শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ মজুমদার ও ঠাকুরমহাশয়ের বন্ধু সেই শচীন বাবু এই তিন জনেই ভক্ত হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইডেন গার্ডেনের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইঁহারা সকলেই তখন বিদ্যার্থী যুবক; মজুমদার মহাশয় এখন বঙ্গবাসী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন এবং অপর দুইজন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের উপাধি লইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল সঙ্গীরা প্রায়ই ঠাকুর মহাশয়ের নিকট নানাবিধ স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন এবং সম্ভবতঃ সাধারণ স্বপ্নের মত অসার বলিয়াই মনে করিতেন; কাজেই স্বপ্নে এই মূর্ত্তি পাওয়ার আদেশ শুনিয়া তাঁহারা একটী পরীক্ষার সুযোগ পাইলেন এবং মহা উৎসাহে সকলে মূর্ত্তির সন্ধানে ইডেন গার্ডেনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

হাইকোর্টের সম্মুখ দিয়া তাঁহারা ইডেন গার্ডেনে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নিকটবর্ত্তী ঝিলের সেতুটীর পূর্ব্বদিকে নারিকেল ও পাকুড় গাছ এক যোগে উঠিয়াছে; কিন্তু কোন মূর্ত্তি প্রথম দৃষ্টিতে কেহ দেখিতে পাইলেন না। অধিকন্তু সকলে দেখিলেন স্থানটী বড়ই অপরিষ্কার; শৃগালবিষ্ঠা ও শুষ্ক পত্রে সমাকীর্ণ। চারিদিকে মূর্ত্তির সন্ধান করিয়া যখন কিছুই মিলিল না তখন সত্যকিঙ্কর বাবু বলিলেন, “গাছ

ঢটী যখন জলের ধারেই, এমন কি শিকড়গুলি পর্য্যন্ত যখন জলে গিয়ে পড়েছে, তখন বোধহয় মূর্ত্তি জলেই আছে; আমাদের দেশে ঐ রকম এক ঘটনা ঘটেছিল; সেও জলেই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল।"

তখন ঝিলের জলে নামা নিষিদ্ধ কি না জিজ্ঞাসা করিবার জন্য শচীন বাবু মালীদের সন্ধানে গেলেন; সত্যকিঙ্কর বাবু একখানা শুষ্ক কাঠ দিয়া জলে খোজ করিতে করিতে কাঠে একটা কিছু অনুভব করিয়া চকিত দৃষ্টিতে ঠাকুর মহাশয়ের দিকে তাকাইতেই তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া নিশ্চয় মূর্ত্তির সন্ধান মিলিয়াছে বুঝিয়া এক লাফেই জলে পড়িলেন এবং বিনা আয়াসেই একখানি মূর্ত্তি বুকে লইয়া ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিলেন।

মুণ্ডিতমস্তকে ঠাকুরমহাশয় যে চাদর জড়াইয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি সেই চাদর দিয়া মূর্ত্তিখানি ঢাকিয়া লওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে শচীনবাবুও মালীদের সঙ্গে লইয়া হাজির হইলেন; ব্যাপার দেখিয়া "কেয়া হায় বাবু, কেয়া হায়?" রবে মালীরা চীৎকার করিয়া উঠিতেই শচীনবাবু তাহাদের হাতে কিছু দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। ঠাকুরমহাশয়ও সবান্ধবে মূর্ত্তি লইয়া একখানি ভাড়া গাড়ীতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

বাড়ীর সকলেই দেখিল, কি সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি! ৺শ্যামামায়ের এমন মূর্ত্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। মূর্ত্তিখানি প্রায় দেড়ফুট উচ্চ, ৺মায়ের মাথার মুকুট হইতে হাতের খাঁড়া, পদ্মাকৃতি প্রস্তরাসনে শায়িত শিবমূর্ত্তির হাতের মালা, ডমরু, ৺মায়ের ছোট জিভটী, হাতের মুণ্ডটী পর্য্যন্ত এক খণ্ড কাল কষ্টিপাথর হইতে খোদাই করা নিখুঁত মূর্ত্তি। ৺মায়ের চক্ষু দুটির মধ্যে কি রত্ন ছিল জানি না; চক্ষুদুটী অন্ধকারে জ্বলিত। দক্ষিণাকালী হইতে মূর্ত্তিখানির পার্থক্য এই যে, নরকরকটিবেড়া ও মুক্তকেশ ইহার ছিল না। কেশের পরিবর্ত্তে তিনটী জটা, মূর্ত্তির সম্মুখে গ্রীবার দুইধারে দুইটি ও

পৃষ্ঠদেশে একটী লম্বিত ছিল ; এবং মূর্ত্তিখানি ত্রিনয়নাও ছিল না ; তৃতীয় নয়নের স্থানে একটী চিহ্নমাত্র ছিল। মোটের উপর মূর্ত্তিখানি দেখিতে বড় সুন্দর ও নিখুঁত ছিল ; কোথাও কোন অঙ্গহানি লক্ষিত হয় নাই।

মূর্ত্তিখানি গোপনেই রাখা হইয়াছিল ; কিন্তু লোকমুখে কথাটা প্রচার হইয়া যাওয়ায় ক্রমে দলে দলে লোকসমাগম হইতে লাগিল ; তখন পুষ্প চন্দনে ভূষিত করিয়া মূর্ত্তিখানি বাহিরের ঘরে রাখা হইল। গৃহস্থের বাটিতে যেন উৎসব লাগিয়া গেল। গৃহকর্ত্রী পূজার আয়োজন করিয়া দিলে প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ঠাকুরমহাশয় ৺মায়ের পূজা করিলেন। সকলে প্রসাদ পাইল ; ঠাকুর সেদিন আনন্দে আত্মহারা; প্রেমে পাগল।তাঁহাকে নিজমুখে বলিতে শুনিয়াছি, 'আমি তখন যেদিকেই চাই সেদিকেই দেখি যেন মায়ের মূর্ত্তি ! স্ত্রীলোকগুলি যেন এক একটী জীবন্ত ৺মা ! ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি যেন ৺মায়ের ছোট ছোট মূর্ত্তি !'

ঠাকুরমহাশয়ের সেদিনের ভাব দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হইয়াছিল, ঠাকুর না আবার পাগল হইয়া যায় ; কারণ, এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে এক অপূর্ব্ব দর্শন লাভ করিয়া ঠাকুর কিছুকাল দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। সে যাহা হউক, সারাদিন এইভাবে কাটিলে রাত্রে ৺মায়ের আদেশ হইল, পরদিবস ৺বাসন্তী বিজয়ার দিন ৺মায়ের মূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ঠাকুরমহাশয় সহজে মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে রাজি হন নাই। ৺মায়ের নিকট অনেক অনুনয় বিনয় তর্ক বিতর্কের পর ৺মা ঠাকুরকে বুঝাইয়া দেন যে মূর্ত্তি রাখিলে তাঁহার কোন কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। ৺মা বলেন, **"এই মূর্ত্তিতে যদি নিতান্তই তুমি আমাকে পূজা করতে চাও, তবে এর অনুরূপ অষ্টধাতুর মূর্ত্তি গড়িয়ে কাশীধামে প্রতিষ্ঠা করে আমার পূজা করো ; আমি তাতেই আবির্ভূতা হব ; শুধু তাতে কেন, তুমি**



স্বপ্নাদেশে ইডেনগার্ডেন হইতে প্রাপ্ত আস্তামূর্তি

ভক্তি করে যে মূর্ত্তিতেই আমাকে ডাকবে আমি সেই মুর্ত্তিতেই আবির্ভূতা হব।"

মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়ার ষোলটী কারণ ৺মা ঠাকুরমহাশয়কে জানাইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে ঠাঁকুরমহাশয় তিনটী মাত্র প্রচার করিয়াছিলেন; যথা—

১। আমি একস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকব না; সকল ভক্তের কাছেই থাক্‌ব; আমায় গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে এস।

২। আমি বিজয়া দশমীতে গঙ্গায় যাবার জন্যই এসেছি।

৩। আমি তোদের শত্রুশক্তি; আমাকে রাখলে তোদের শত্রুশক্তি বৃদ্ধি হবে; কার্য্যসিদ্ধি হবে না।

এই সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ৺মা গঙ্গায় মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে আদেশ করেন। ৺মা আরও বিশেষভাবে বলিয়া দেন, "আমার নাম 'আদ্যাশক্তি'; 'আদ্যামা' বলে আমার পূজা করতে হয়। আমি কেবল শাস্ত্রবিহিত মতেই যে পূজা পেতে চাই তা নয়; 'মা খাও' মা পর' বলে প্রাণের ভাষায় সকল বস্তু আমায় নিবেদন করে ব্যবহার করলেও আমার পূজা হয়; সরল প্রাণের প্রার্থনাই আমার উপাসনা; আর যদি কোন ভক্ত আমার সম্মুখে আদ্যাস্তব পাঠ করে, তাহলে আমি বিশেষ আনন্দিত হই। মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়ে ভক্তের ঘরে ঘরে আমায় প্রচার কর।"

৺মায়ের আদেশে ঠাকুরমহাশয় মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেও উপস্থিত দুই একজন ভিন্ন সকলেই মূর্ত্তি বিসর্জ্জনের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। সকলেরই ইচ্ছা এমন জাগ্রত মূর্ত্তিখানি রাখিয়া সেবা পূজার ব্যবস্থা করা হয়। একদিনের মধ্যেই ৺মায়ের আবির্ভাবের এই শুভ সংবাদ এতদূর প্রচার হইয়াছিল যে Museumএর তরফ হইতে দুইজন মাদ্রাজী ও একজন দেশীয় সাহেব কর্ম্মচারীও মূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় মূর্ত্তিখানি বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হয়; এবং যথেষ্ট অর্থের বিনিময়ে তাঁহারা মূর্ত্তিখানি যাদুঘরে (Museum) লইয়া যাইতে চাহেন। এই প্রলোভনের প্রশ্রয় না দিয়া ঠাকুর মহাশয় জানাইয়া দিলেন, অর্থের বিনিময়ে ৺মায়ের মূর্ত্তি দেওয়া যায় না; যাদুঘরের প্রয়োজন হইলে বিসর্জ্জনের পর গঙ্গাগর্ভ হইতে তাঁহারা উঠাইয়া লইবেন। তিনি বলিলেন, 'মা স্বয়ং আসিয়াই যখন স্বয়ং চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন তখন তাঁহাকে নিজ নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধরিয়া রাখিবার কোন অধিকার বা ইচ্ছা আমার নাই।'

বাসন্তী নবমীর দিন ৺মা আসিলেন; বিজয়া দশমীর দিন চলিয়া গেলেন। ফটোগ্রাফার দ্বারা ৺মায়ের ফটো তোলাইয়া সন্ধ্যার পর ভক্ত বন্ধু বান্ধব সঙ্গে ঠাকুরমহাশয় ৺মাকে নৌকা করিয়া হাওড়ার পুলের দক্ষিণে লইয়া গিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন। তখনকার হিতবাদী, বসুমতী, বেঙ্গলী প্রভৃতি সাময়িক সংবাদপত্রাদিতে ৺মায়ের প্রতিমূর্ত্তিসহ ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের গোচর করা হইয়াছিল এবং কাশীধামে ৺মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য সংগ্রহও হইল। কাশীধামে গিয়া ঠাকুরমহাশয় নূতন মন্দিরের জন্য স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক তদীয় মাতুল শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

* অলৌকিকভাবে প্রাপ্ত আদ্যামূর্ত্তির প্রাচীন ইতিহাস ঠাকুর মহাশয়ের 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত আছে।

দ্বারা পূজার ব্যবস্থা করিয়া মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করিবেন, এমন সময়ে ৺মা আদেশ করিলেন, '**তুমি যদি স্বয়ং পূজা করতে না পার, তাহলে কাশীতে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই; পরে যেমন আদেশ হয় করো।**'

৺মায়ের মূর্ত্তি পাওয়ার ঘটনার পর হইতে ঠাকুরমহাশয়ের সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়া গেল। সংসারেই তিনি ছিলেন; পিতামাতার সেবার জন্য কলিকাতায় আজ এখানে কাল সেখানে থাকিয়া কিসে কিছু উপার্জ্জন করিয়া পিতৃমাতৃচরণে পৌছাইতে পারেন সে চেষ্টারও কোনরূপ ক্রুটী করেন নাই; কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি ও কবিরাজী করিবার আকাঙ্ক্ষা একেবারে অন্তর্হিত হইল। পরে ভগবান রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে লছমনঝোলায় লইয়া গিয়া যে কর্ম্মের ভার দেন সেই কর্ম্ম উপলক্ষেই তাঁহাকে আদেশ অনুযায়ী গঙ্গাতীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে হয়। তাঁহার সাধন সময়ের সেই যুগে ৺মায়ের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার সাধনগৃহেই থাকিত। সাধনায় সিদ্ধি হইলে ৺মায়ের মূর্ত্তি সাজাইয়া সমারোহের সহিত উৎসব সম্পন্ন হয়। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ৺মা আদ্যাপীঠেই আছেন; আদ্যাপীঠেই তাঁহার সেবাপূজা বিশেষভাবে হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন ৺মায়ের আদেশ অনুযায়ী ভক্তের ঘরে ঘরে যাহাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় সেইভাবে বিনামূল্যে ৺মায়ের প্রতিমূর্ত্তি এতাবৎ আদ্যাপীঠ হইতে জনসমাজে প্রচারিত হইতেছে। ৺মা যে আদ্যাপীঠে আছেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; আদ্যাপীঠের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেই সকল প্রামাণিক ঘটনার অনুসরণ করিব। এক্ষণে আদ্যাপীঠের কর্ম্মের মূল উৎস ভগবান রামকৃষ্ণের সেই আদেশবাণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া লছমনঝোলার পথে ঠাকুরমহাশয় যে ভাবে পরিচালিত হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

লছমনঝোলার পথে

বঙ্গীয় সন ১৩২১ সালের বাসন্তী বিজয়ায় আন্তামূর্ত্তি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। তাহার পর প্রায় চারি বৎসরের উপর ঠাকুর মহাশয় অস্থিরচিত্তে কলিকাতায় অতিবাহিত করেন। এই সময় পিতামাতার সেবার জন্য অর্থোপার্জ্জনের আশায় নানাবিধ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষদিগের জীবনী অবলম্বনে তিনি কয়েকখানি নাটক ও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সাধকের মধুর মাতৃভাবের ও সখ্যভাবের বহু সঙ্গীতও তিনি ঐ সময়ে রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সঙ্গীতগুলির কিছু কিছু পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছে এবং নাটকগুলির প্রায় সমস্তই আমরা হারাইয়াছি। সে যাহা হউক, ঐ ভাবে অস্থির চিত্তে নানা চেষ্টায় চারি বৎসরের উপর অতিবাহিত হইলে বাংলা ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে ভগবান রামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়কে ঝুলনপূর্ণিমার দিন লছমনঝোলায় উপস্থিত থাকিতে আদেশ করেন; এবং জানাইয়া দেন যে, সেই তিথিতে যে আদেশ হইবে সেই আদেশ অনুযায়ী কাজ করিলেই শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের দেহধারণ সার্থক হইবে।

আদেশ অনুযায়ী ঠাকুরমহাশয় ঝুলনপূর্ণিমার পূর্ব্বেই লছমনঝোলার পথে হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার পথে তিনি মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়া যান। ঠাকুরমহাশয়ের লছমনঝোলাযাত্রা ব্যাপারের আদ্যোপান্ত ভগবৎকৃপার এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। যাত্রার সেই শুভদিন সম্বন্ধে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'আহা! সে কি পবিত্র দিন! সে কি মহান বৈরাগ্য! তত্ত্বজ্ঞানে তখন হৃদয় পরিপূর্ণ। হৃদয়ের কোন প্রদেশে বা চিন্তার কোন ধারায়, সংসারের কোন ভাব, কোন ভাষা বা কোন অভিনয়ই স্থান পাইতেছে না। সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যাদেশ ও ৺মায়ের মোহিনী মূর্ত্তি বিরাজিত। আর থাকিয়া থাকিয়া সেই নবজলধর বৃন্দাবনবিহারী যুগল মূর্ত্তিতে নয়নে প্রতিভাত হইতেছেন। মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনভাবে শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে; হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে; প্রাণে এক তুমুল আনন্দকোলাহল উত্থিত হইতেছে। কবে মথুরায় পৌঁছিব, কবে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব, কেবল এই চিন্তা! সেই শুভদিন সেই শুভ সংযোগ এজীবনে আর ঘটিবে কি না জানিনা; জন্মজন্মান্তরের কত পুণ্যবলে, মাতাপিতার কত আশীর্ব্বাদের ফলে যে এমন দিন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া বলিব?'

জীবদেহে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের শ্রীমুখে এই সকল কাহিনী শ্রবণ করা আর সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। আজ তিন বৎসরের অধিক হইল তিনি অপ্রকট হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের অংশবিশেষ অবলম্বনে তাঁহারই স্বহস্তলিখিত "স্বপ্নজীবন" ব্যতীত ঠাকুরমহাশয়ের কোনরূপ জীবনীও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সেই জন্যই সময়োপযোগী দুই একটী ঘটনা বিবৃত করিয়া সেই পবিত্র আধারের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হইতেছে।

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে মথুরায় পৌঁছিয়া শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় যমুনাতীরে আশ্রয় লইয়া প্রেমনয়নে চতুর্দ্দিকেই লীলাময়ের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন; ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশে তিনি গৈরিক ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশেই যাত্রা করিয়াছিলেন। তীব্র বৈরাগ্যে তাঁহার ত্যাগের ভাব তখন এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে দরিদ্র দুঃখী যেই তাঁহার সম্মুখে পড়িতেছে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পাইতেছে; এই সব দেখিয়া শুনিয়া এক রামায়েৎ তাঁহার সঙ্গ লইল। দেখিতে দেখিতে রামায়েৎ একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল; কিছুতেই সে সঙ্গ ছাড়ে না; বলে, 'আমি তোমায় গোকুলে নিয়ে যাব;

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন করাব। তোমায় মাথায় করে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রম কর্‌ব।'

ঠাকুরমহাশয় অগত্যা মথুরায় রামায়েতের সঙ্গেই কাটাইতে লাগিলেন। রামায়েৎ তাঁহাকে মথুরানাথের প্রসাদ আনিয়া খাওয়াইত, নাচিতে নাচিতে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে রামলীলা কৃষ্ণলীলা শুনাইত, আর ভিক্ষুকদিগকে দান করিতে বা অন্য কোন কারণে অর্থব্যয় করিতে দেখিলে, ঐসকল অপব্যয় সম্বন্ধে ঠাকুরমহাশয়কে সদুপদেশ দিত। দিন দুই এইরূপে কাটাইয়া রামায়েৎ তাঁহাকে দুর্ব্বাসা আশ্রম দেখিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিল। বিশেষ আপত্তির কারণ নাই দেখিয়া ঠাকুরমহাশয় আশ্রম দর্শনে যাইতে রাজি হইলেন। এই সকল ঘটনার স্বহস্তলিখিত বিবরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। "স্বপ্নজীবন" গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—

সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া রামায়েৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ কি আশ্রম দর্শনে যাওয়া হবে?'

রামায়েৎ বলিল, 'হাঁ হবে; কেন? ভয় কি? জ্যোৎস্না রাত্রি: আমি আছি; তোমায় মাথায় করে নিয়ে যাব। শিগ্‌গির সব গুছিয়ে নাও।'

আমার আর গুছাইবার তেমন কিছুই ছিল না। কেবল এক কৌপীন ও বহির্বাস আর একখানি গীতা। ইহা ছাড়া মথুরা গিয়া যে যুগলমূর্ত্তিখানি ক্রয় করিয়াছিলাম তাহা কম্বলে জড়াইয়া গামছা বাঁধিয়া স্কন্ধে লইলাম এবং কমণ্ডলুটী হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম রামায়েৎ আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বাঃ বেশ মানিয়েছে; টাকা কড়ি কোথায় রাখ্‌লে?' আমি কোমরে হাত দিয়া বলিলাম, 'এই টেঁকে।'

দেখিতে দেখিতে নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল; আমরা নৌকায় উঠিলাম। আহা যমুনায় সেদিন কি সুন্দর দৃশ্য! সজ্জিত বড় বড় নৌকায় রাসলীলা আরম্ভ হইয়াছে অসংখ্য দর্শক নৌকার পর নৌকায় চলিয়াছে। রাসলীলায় যাহাদিগকে রাধাকৃষ্ণ সাজা হইয়াছে তাহাদিগকে এমন সুন্দর দেখাইয়াছে যেন মনে হয় সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সং সত্যই যমুনায় নৌকাবিহার করিতেছেন। যিনি মথুরায় এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছে তিনিই শুধু বুঝিবেন। অন্যে এ লীলার মর্ম্ম কি বুঝিবে? আমি নৌকায় উঠি নির্নিমেষ নয়নে সেই দৃশ্য দেখিতেছি আর রামায়েৎ রাসলীলার ব্যাখ্যা করিয়া আম

শুনাইতেছে। রাসলীলার এই অভিনয় দর্শন শ্রবণে আমার নয়ন মন এমন তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কখন যে নৌকা হইতে তীরে উঠিয়াছি কিছুই মনে নাই। ক্ষণকাল পরে দেখি রামায়েৎ আমার হাত ধরিয়া এক মাঠের উপর দিয়া লইয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে ক্রমশঃ দুইজনে লোকালয়ের বাহিরে গিয়া পড়িলাম। আমার বোধ হইল দুই ক্রোশের উপর আসিয়াছি; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর কতদূর যেতে হবে? তুমি বললে এক ক্রোশ; এ যে দু ক্রোশের উপর এসেছি বলে বোধ হচ্চে।'

রামায়েৎ হাসিয়া বলিল, 'না বাবা; তোমার জ্ঞান ছিল না কি না? তাই তোমার এ রকম মনে হচ্চে।'

আমি বলিলাম, 'তুমি এদিক দিয়ে চলেছ কেন? এদিকে রাস্তা আছে বলে ত মনে হয় না? এ যে একেবারে জঙ্গল? সামনে আরও নিবিড় বন আছে বলেই ত মনে হচ্চে।'

বাস্তবিক তখন আমরা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি সেখানে সত্যই নিবিড় জঙ্গল; জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। জ্যোৎস্না রাত্রি বলিয়া যাহা কিছু দেখা যাইতেছে; কৃষ্ণা রজনীতে সেস্থান সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া বোধ হইল। বাদানুবাদ করিতে করিতে আরও দশ পনর মিনিট তাহার সহিত চলিয়া আমি বলিলাম, 'বাবাজী, তুমি নিশ্চয় ভুল পথে এসেছ। দেখ, এখনও ভাল করে দেখ, চিনতে পারছ কি না।'

রামায়েৎ আমার কথায় থমকিয়া দাঁড়াইল এবং চতুর্দ্দিক দেখিয়া শুনিয়া উৎকর্ণভাবে ক্ষণকাল থাকিয়া আমায় বলিল, 'বাবা, তুমি একটু দাঁড়াও; আমি একবার দেখে আসি কারও দেখা পাই কি না।'

এই কথা বলিয়া রামায়েৎ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। আমি সেই নিবিড় বনে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাইতেছি আর মধ্যে মধ্যে 'জয় মথুরানাথ' 'জয় মথুরানাথ' বলিয়া সাহস লইতেছি। তখন হৃদয়ে বৈরাগ্য থাকায় সাহসও যথেষ্ট ছিল; তাই কোনরূপে খাড়া ছিলাম। নতুবা সেই নিবিড় বনের নিশীথ নীরবতা ও ঘন অন্ধকারের ভীষণ গভীরতা সাধারণ অবস্থায় সহ্য করা অতি দুরূহ। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর যেন মনে হইল কে বা কাহারা আসিতেছে; যেন মানুষের পদশব্দ শুনিতে লাগিলাম। উৎকর্ণ হইয়া শব্দ শুনিতে শুনিতে এবং সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে দেখিলাম অদূরে মাথায় পাগড়ি বাঁধা লাঠি হাতে ভীমকায় দুই ব্যক্তি, যে পথে রামায়েৎ চলিয়া গিয়াছিল, সেই পথ দিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ দেখিয়া প্রথমে ভরসা হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই উহাদের যমদূতের মত আকৃতি

ও দস্যুজনসুলভ চঞ্চলতায় আমাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে চঞ্চল করিয়া তুলিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি?'

আমি উত্তর না দিতেই আর একজন, 'সাধু, এমন সময় এখানে কেন?' বলিয়াই আমার হাত ধরিল। আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কি চাও?'

একজন বলিল, 'যা আছে শিগ্‌গির দাও; নয় ত প্রাণে মারা যাবে।'

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার নিকট যে সাত টাকা বার আনা চৌদ্দ আনা ছিল তাহা সমস্ত তাহাদের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামায়েৎ কোথায়? সে যে আমাকে আশ্রমে নিয়ে যাবে বলে নিয়ে এল?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, 'কোন শালা রামায়েৎ? কোথায় এখানে আশ্রম?'

প্রথম ব্যক্তি বলিল, 'সে বেটা ডাকাত; শিগ্‌গির আর কি আছে দিয়ে দাও; নয় ত সে এসে পড়্‌লে প্রাণে মারা যাবে।'

আমি বলিলাম, 'সে বেটা ত ডাকাত; আর তোমরা ত সাধু। তা তোমরা যাই হও, আমার কাছে আর এক কাণা কড়িও নেই। এখন কোন দিকে গেলে আমি রাস্তা পাব বলে দাও দেখি?'

আমার কথায় অট্টহাস্য করিয়া তাহারা বলিল, 'চালাকি করলে চল্‌বে না; আমরা জানি তোমার কাছে অনেক টাকা আছে; তুমি বড়লোকের ছেলে। শিগ্‌গির টাকা বের কর।'

আমি যত বলি কিছু নাই, তাহারা ততই টাকার জন্য জিদ করে; শেষে আমি রাগিয়া 'যা বেটা তোরা মানুষ নোস্; তোরা পশু।' বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই একজন লাঠি দিয়া পথ আটক করিয়া বলিল, 'তোমার ঐ তল্পীর ভেতর কি আছে আগে খুলে দেখাও, তবে যেতে দেব।' দেখিতে দেখিতে একজন আমার পুঁটুলি চাপিয়া ধরিল। আমিও যথাশক্তি পুঁটুলিটি বগলে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'এ আমি তোমাদের কিছুতেই দেব না।'

আমি যে বাস্তবিক কম্বলের মমতায় পুঁটুলি চাপিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা নহে; কম্বলখানি ছিল আমার মায়ের গায়ের। বাড়ী হইতে আসিবার সময় মা আমায় এই কম্বলখানি দিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই কম্বল সঙ্গে থাক্‌লে তোর কোন বিপদ হবে না।' তাই আমি কম্বলখানি ছাড়িতে নারাজ হইতেছিলাম। মায়ের আশীর্ব্বাদী কম্বলখানি রক্ষা করিতে মথুরানাথ এমন শক্তি দিয়াছিলেন যে সেই ভীমকায় দস্যুদ্বয় কিছুতেই পুঁটুলি কাড়িয়া

লইতে পারিল না। তল্পীটি অবশ্য গামছায় বাঁধা আমার বগলের নীচে গাঁট দেওয়া ছিল। কোনরূপে আমার নিকট হইতে লইতে না পারিয়া একজন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'শালাকে বেঁধে ফেল।' অমনই আর একজন এক ধাক্কায় আমাকে একটী গাছের নিকট লইয়া গিয়া আমারই বহির্বাস দ্বারা আমাকে গাছের সহিত বাঁধিতে লাগিল। আমি তখন মথুরানাথকে ভুলিয়া কেবল মাকেই স্মরণ করিতেছি। 'মা রক্ষা কর; মা রক্ষা কর; তোমার কথা যেন ব্যর্থ না হয়; সতীবাক্য যেন নিষ্ফল না হয়।' এই বলিয়া কেবল মাকেই ডাকিতেছি, এমন সময় কি আশ্চর্য্য! অদূরে দ্রুত পদধ্বনি ও 'পাকড়াও' 'পাকড়াও' শব্দ শ্রুত হইল।

'পাকড়াও' 'পাকড়াও' শব্দে দস্যুদ্বয় চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তখন আরও নিকটে শুনিলাম 'পাকড়াও, পাকড়াও;' এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম একটী ধোপার গাধা সম্ভবতঃ দড়ি ছিঁড়িয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। রাসভনন্দন আমাকে সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে একটী যুবতী স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিতেই গর্দ্দভ পুনরায় দৌড়িল। স্ত্রীলোকটী আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিল; তাহার পশ্চাৎ একজন পুরুষ, দেখিলে রজক বলিয়া বোধ হয়, আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধোপানী আমাকে দেখাইয়া পুরুষটীকে কি বলিলে সে ধীরপদে আমার কাছে আসিয়া আমায় ভালরূপে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বলিল, 'বাবা, তোমায় কি ডাকুতে ধরেছিল?'

আমি উত্তর করিলাম, 'হাঁ।'

'তুমি কেমন বোকা সাধু?' বলিয়া রজক আমার বন্ধন খুলিতে লাগিল; আমি অতি সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানাইলে সে বলিল, 'তুমি এখানে নতুন এসেছ; কিছু জান না। এ সব এমন সাংঘাতিক জায়গা যে সিকি পয়সার জন্য মাথায় লাঠি মারে; ভাগ্যে তোমায় কিছু বলে নি।'

আমি তখন অবাক হইয়া দুইজনকে দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, কে ইহারা? এই নিবিড় বনে গর্দ্দভ তাড়াইবার ভাণ করিয়া আমায় উদ্ধার করিতে আসিল, কে ইহারা? আমায় চিন্তিত দেখিয়া রজকিনী বলিল, 'বাবা, মথুরানাথ তোমায় রক্ষা করেছেন।'

'যা হোক, তুমি খুব বেঁচে গেছ; এখন এস।' বলিয়া রজক এক দিকে কয়েক মিনিট যাইতেই যমুনার জল দেখা গেল। * * * * * নিঃশব্দে উভয়কে উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিয়া আমি সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

*   *   *   *   *   *

মথুরা হইতে বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছি। এক ক্রোশ পথ চলিতে না চলিতে পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল। রাস্তায় কোথাও একবিন্দু জল পাইলাম না। বিপরীত দিক হইতে কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী মথুরায় আসিতেছিল। তাহাদের প্রত্যেকের কমণ্ডলুতে কিছু কিছু জল ছিল; কিন্তু আমার অতীব কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও তাহারা কেহ আমায় একটু জল দিল না; বলিল, 'এখনও আমাদের একক্রোশ পথ যেতে হবে; তোমায় জল দিয়ে কি শেষে নিজেরা মারা যাব? তুমি কমণ্ডলু করে জল আননি কেন?

আমি বলিলাম, 'আমার কমণ্ডলু শতছিদ্র।'

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'একটু এগিয়ে যাও; আগে ফাঁড়ি আছে; ফাঁড়িতে খাবার জল থাকে।'

অগত্যা আমি পিপাসাপীড়িতদেহে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। প্রখর রৌদ্রতাপে ধূলিরাশি তপ্ত বালুকণার মত আমার পদদ্বয় দগ্ধ করিতে লাগিল। ওঃ কি ভীষণ সে যন্ত্রণা! জীবনে আমি এমন কাতরতা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। কিছু দূর গিয়া রাস্তার পশ্চিমে ফাঁড়ি দেখিতে পাইলাম। ফাঁড়ি দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আমি আশ্বস্ত হইয়া ফাঁড়ির চৌকিদারদিগের নিকট গিয়া জল চাহিলাম। দুই তিন জন চৌকিদার উপস্থিত ছিল; আমার প্রার্থনায় তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিল; কেহ কিছু উত্তর দিল না। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া আমি যেন দৃঢ়কণ্ঠেই বলিলাম, 'তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যায়; শিগ্‌গির জল দাও; আমায় জল দিতেই হবে; না হলে প্রাণে মারা যাব।'

চৌকিদারদিগের মধ্যে জনৈক পাষাণহৃদয় মূর্খ উত্তর করিল, 'তুমি মারা গেলে আমাদের কি? এখানে জল পাবে না; যাও।'

কথা শুনিয়া আমি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম। ভাবিলাম, হায়! ইহারা কি জনপদের শান্তিরক্ষক? না, ইহারাই গুণ্ডা ডাকাত; সকল সর্ব্বনাশের মূল! ইহাদের ব্যবহারে সেদিনকার দস্যুদিগের কথা মনে হইল। আমি উষ্ণ হইয়া পুনরায় বলিলাম, 'ওই ত ঘড়ায় জল রয়েছে; তোমরা আমায় জল দিচ্ছ না কেন?' আরও কত কি তাহাদিগকে বলিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের মন গলিল না। সাধুদের মত তাহারাও বলিল, তোমাকে জল দিয়ে কি শেষে আমরা তেষ্টায় মারা যাব! আমাদের তখন কে জল দেবে? যাও এখানে জল পাবে না।'

আমি অগত্যা সেস্থান হইতে চলিলাম। পিপাসাদগ্ধ হৃদয়ের কাতরতায় চোখে জল আসিল ; আবার ক্রোধদীপ্ত মস্তিষ্কের উত্তাপে সে বারিবিন্দু শুকাইয়া গেল। আমি স্খলিতপদে অগ্রসর হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, একি অস্থিরতা! এর কারণ কি? কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে পথ চলিতে লাগিলাম। একগুণ পথ অতিক্রম করিতে চারগুণ সময় লাগিতেছে, আর মনে হইতেছে, হায়! এ কি বিষ্ণুমায়া! বৃন্দাবনচন্দ্রের এ কি লীলা! একবার মনে হইল, আমি এখনও মলিনতা দূর করিতে পারি নাই ; এখনও বৈরাগ্যের প্রখর আলোকে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হই নাই। বৃন্দাবন অভিমুখে আমি চলিয়াছি ; পবিত্র ধাম বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আমি ধন্য হইব ; সামান্য পাপ, সামান্য মলিনতা, সামান্য সন্দেহ থাকিলে ত সেথায় পৌঁছাইতে পারিব না। তাই বুঝি প্রেমময় আমার পাপরাশি দগ্ধ করিবার জন্যই আমার প্রাণে দারুণ তৃষানল জ্বালিয়া দিয়াছেন? তাই বুঝি এই পথ, এই সামান্য ব্যবধান ফুরাইয়াও ফুরাইতেছে না? প্রাণাধিক প্রাণেশ আমার! একবার ফিরিয়া চাও ; আর দুঃখ দিও না। এ দারুণ পিপাসার নিবৃত্তি কর প্রভু! হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধু! আমায় কৃপা কর ; দীনবন্ধু! এ দীনের পানে ফিরে চাও।

মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম জনৈক ব্রজবাসী রাস্তার ধারে একটী কূয়ার পাশে বসিয়া হাত ধুইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার আশার সঞ্চার হইল ; আমি 'জয় রামকৃষ্ণ! জয় বৃন্দাবনবিহারী!' বলিয়া ব্রজবাসীর দিকে অগ্রসর হইলাম। ব্রজবাসী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চাই?'

আমি বলিলাম, 'জল ; তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায় ; আমায় একটু জল দিন।'

তখন সন্ধ্যা হয় হয় ; সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিতেছেন। মৃদুমন্দ সান্ধ্য বায়ু বৃক্ষপল্লব স্পন্দিত করিতেছে। আমার কথা শুনিয়া ব্রজবাসী বলিলেন, 'ইয়ে কড়া পানি ; পিনে নেহি সকোগে।'

এবার আমি সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলাম। অতি কাতরভাবে ব্রজবাসীকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম, 'বাপু হে, তেষ্টায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত ; আমায় রক্ষা কর ; জল দাও ; লোণা হোক, বোদা হোক, কড়া হোক, আমায় জল দাও ; পিপাসায় আমার প্রাণ যায়। এখন যে কোন জল পেলেই আমি প্রাণে বাঁচি ; দাও— দাও, আমায় জল দাও।'

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ব্রজবাসীর এ কি হৃদয়হীন আচরণ! আমার সকল অনুরোধ সে উপেক্ষা করিল; কিছুতেই আমায় জল দিল না। আমি কাতরনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম; আর সে, 'ক্ষরাপানি, পিনে নেহি সকোগে' বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া তৃষাপীড়িত দেহে কূয়ার ধারে বসিয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে ব্রজবাসী দৃষ্টির বহির্ভূত হইল: আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া জলের অভাবে জলের শীতলতার আশায় প্রায় বুক পর্য্যন্ত কূয়ার মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ ঐরূপে থাকিবার পর যেন দুইটী বালক বালিকার মধুর কথোপকথন শব্দ শুনিতে পাইলাম।

সচকিতভাবে মাথা তুলিয়া দেখিলাম একটী বালক ও একটী বালিকা নানা বেশভূষায় ভূষিত হইয়া পরস্পর নানাবিধ কৌতুক করিতে করিতে কূয়ার দিকে আসিতেছে। সেই আনন্দময় পুরুষ প্রকৃতির বদনকমলে প্রেমানন্দ যেন উছলিয়া উঠিতেছে। হাসিতে হাসিতে তাহারা একজন আর একজনের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহাদের ভাব ভাষা, তাহাদের অঙ্গভঙ্গী যেন এক অভিনব ভাবে আমায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। অনিমেষ লোচনে দেখিতে দেখিতে যেন আমি উঠিয়া বসিলাম। নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবেই তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছি; ক্রমশঃ দেখিলাম তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে একটী ঘটী ও এক গাছি দড়ী রহিয়াছে; তাহারা জল তুলিতেই কূয়ার ধারে আসিয়াছে। হাস্য পরিহাস করিতে করিতেই তাহারা জল তুলিয়া একজন আর একজনের গায়ে জল ছিটাইয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহাদের হাস্য কলরবে স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠিল। আহা! কি মনোরম সে দৃশ্য! লেখনীর সাধ্য নাই সে দৃশ্যের বর্ণনা করে। তাহার উপর কি সুন্দর তাহাদের বেশভূষা! সেই মথুরায় যমুনাবক্ষে বালক বালিকারা রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া রাসলীলার যে অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেছিল, ঠিক সেইরূপ। আমি এই বালক বালিকা দুটীকেও ঐ শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রী মনে করিলাম এবং ভাবিলাম, তাহা হইলে বৃন্দাবন আর অধিক দূর নয়। প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল; হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইল। তখন তাহাদের মধ্যে একজন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাই?'

আমি বলিলাম, 'জল; আমার বড় পিপাসা;—আমায় জল দাও।'

বলিবামাত্র সে কূয়া হইতে জল তুলিয়া সযত্নে আমার হাতে ঢালিয়া দিতে লাগিল। আমি জল পান করিতে লাগিলাম। আহা কি মধুর! কি সুমিষ্ট জল! এই জলকে কি না

করা পানি বলিয়া হৃদয়হীন ব্রজবাসী আমায় পান করিতে দিল না! ছাতিফাটা তৃষ্ণায় প্রায় দুই ঘটী জল নিঃশেষে পান করিয়া বলিলাম, 'আর না'। এই 'আর না' শব্দ দিয়া আমার পরিতৃপ্তির আভাষ পাইয়া তাহারা একবার করুণ নয়নে এই দীনহীনের পানে চাহিল। মরি! মরি! কি সে চাহনি! সেই সুধামাখা দৃষ্টিতে কি অপার শান্তি, কি অপরিমিত তৃপ্তিই যে নিহিত ছিল তাহা কেমন করিয়া বলিব?

জীবনে সুন্দর কত কি দেখিয়াছি। শারদীয়া জ্যোৎস্নায় কুমুদিনীর কোমল হাসি দেখিয়াছি; তরুণ তপনের কোমল কিরণস্নাত কমলিনীর স্ফুটনোন্মুখ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি; বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আরক্তিম সৌন্দর্য্যমহিমা দেখিয়াছি; আরও কত কি সুন্দর এ জীবনে দেখিলাম; কিন্তু এমন সুন্দর দৃষ্টিমাধুর্য্য ত আর কখনও দেখি নাই। আহা! চোখের চাহনিতে যে এমন ভাব, এমন করুণা, এত আকর্ষণ থাকিতে পারে তাহা ত জানিতাম না। আমি আত্মহারা হইলাম। মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নাই; শুধু চাহিয়া আছি। হায়! আমার একি হইল! দুটী ভাল কথা বলিয়াও একবার তাহাদের আদর করিলাম না? যখন তাহারা দৃষ্টি ফিরাইয়া সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, তখন শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ভাই, তুমলোক কাঁহাকে রহনেওয়ালা হায়?'

উত্তরে শুনিলাম, 'হামলোক কি আস্তানা রঙ্গনাথজী কি মন্দির।'

আমি মনে করিলাম যেমন মথুরায় দেখিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় এখানেও তেমনই উহারা রঙ্গনাথজীর মন্দিরে লীলা অভিনয় করিতেছে। যাক, আমিও রঙ্গনাথের মন্দিরে গিয়া পুনরায় উহাদের দেখিব এবং উহাদের মুখে লীলাকীর্ত্তন শুনিয়া ধন্য হইব। কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া আরও কিছু বিশ্রামের পর আমি আবার পথ চলিতে লাগিলাম।

* * * * * *

বহুক্ষণ ঘুরাঘুরি করিয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। দেখিলাম বড় বড় খাবারের দোকানে নানাবিধ উপাদেয় খাবার প্রস্তুত হইতেছে। বড় বড় কচুরী ভাজিতেছে; যেমন তেমন কচুরী নয়; তখনকার দিনের চার পয়সায় একখানি কচুরী; এখন আন্দাজ করিয়া দেখুন সে কি জিনিষ। কচুরীর আকর্ষণে অজ্ঞাতসারে দোকানের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মনে হইল, আগে যমুনায় হাত মুখ ধুইয়া আসি, তারপর যাহা হয় কিছু

কিনিয়া জলযোগ করিব। এই ভাবিয়া আমি যমুনা অভিমুখে চলিলাম। যমুনায় যাইতে লালাবাবার মন্দির হইতে বেশ খানিকটা যাইতে হয়; তারপর বেলাভূমি অতিক্রম করিতেও খানিকক্ষণ লাগে। আমি সেই বিস্তীর্ণ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এমন শ্রান্ত বোধ করিলাম যে পুনরায় ফিরিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে আর ইচ্ছা হইল না। কোনরূপে যমুনায় হাতমুখ ধুইয়া খানিকটা যমুনার জল পান করিয়া সেই নদীতটে বালুরাশির উপরেই শুইয়া পড়িবার জন্য আসন পাতিলাম।

আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ শ্রান্তি অপনোদন করিয়া লক্ষ্য করিলাম আমার উভয় পার্শ্বে বহু নাগা সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছে; কেহ ধ্যানে মগ্ন, কেহবা স্তবস্তুতি করিতেছে, আবার কেহবা ধুনির পার্শ্বে শুইয়া আছে। সাধুদিগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার মন এক অজানা রাজ্যে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। আমিও কিছুক্ষণের জন্য সকল ভুলিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ যেন কাহার সুললিত সঙ্গীতের মোহন সুরে আমায় জাগাইয়া দিল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম আমারই আসনের অনতিদূরে এক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী আসন করিয়াছেন; তাহারা উভয়েই বাঙ্গালী; উভয়েই মুণ্ডিতমস্তক; শিখা তিলক প্রভৃতি বৈষ্ণব বেশের কোন অঙ্গ বাদ যায় নাই। বৈষ্ণবের বয়স ১৮।২০ বৎসরের অধিক নহে; বৈষ্ণবী মার বয়স আরও ৬।৭ বৎসর অধিক বলিয়া বোধ হইল। বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে এ জাতীয় বৈষ্ণবের বহু নিন্দাবাদ শুনিয়াছিলাম। তাই ইহাদিগকে দেখিয়া প্রথমে মনে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল। এমন সময় যুবতী বৈষ্ণবী নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া গান ধরিল—

'কালা তুমি ছল করে অবলা মজাও।
বাঁশীর স্বরে ডেকে এনে এখন কেন যেতে কও॥' ইত্যাদি

গানটীর ভাব অতি মনোহর হইলেও ইহাদের অভিনয়ে যেন আমার তেমন ভাল লাগিল না; কিন্তু সুরের কি মোহিনী শক্তি! গানের সুরে মোহিত হইয়া আমি একেবারে চিত্রার্পিতবৎ উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঝুলন পূর্ণিমার আর অধিক দিন নাই। শুক্ল পক্ষের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত যমুনাতট সাধু সন্ন্যাসী সমাগমে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; আর সেই সাধু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ক্রমেই আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী থামিলে বৈষ্ণব গান ধরিল,—

'কেন মরতে এলে কুলের নারী কালার প্রেমে পড়ে ?
যেমন, আঁধার রাতে দীপের আলোয় পতঙ্গ পুড়ে মরে।
প্রেমের জ্বালায় ঝালাপালা আজও বলি পালা পালা,
পালিয়ে যারে কুলের বালা, পড়িস নে রে প্রেমের ফেরে ॥'

এইরূপে উভয়ে একটীর পর একটী করিয়া বিভোরভাবে গাহিয়া যাইতেছে। গভীর নিশায় নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে এই পুরুষ প্রকৃতির লীলা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া আমার নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। গান বন্ধ হইলে উভয়ে আর এক লীলা আরম্ভ করিল। উভয়ের সেই বাকবিতণ্ডা ; সেও এক মজার দৃশ্য। সেখানে সমাজ শাসনের বিধি নিষেধ নাই, সভ্য শোভন বিচার বিবেচনার স্থান নাই ; আছে শুধু পুরুষ প্রকৃতির ভাববিনিময়, বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর মধুর ভাবের অভিনয় ; আর রস-সাধনের অকৃত্রিম নিদর্শন। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর বৈষ্ণবীমা বাবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'ওরে মুখপোড়া, তোর সঙ্গে আমি কথায় পারব না ; এখন যা দেখি, আগে কিছু খাবার নিয়ে আয়।'

বৈষ্ণব বলিল, 'কত আনব লো মুখপুড়ি : তাই আগে বল ?'

'কত আবার আনবি ? যেমন গিলতে পারবি তেমন আনবি। যা শিগ্‌গির নিয়ে আয়।'

'তাই বল্ না ;' বলিয়া বাবাজী তীর অভিমুখে অগ্রসর হইল ; আমিও চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাবাজী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। চাদরের ফাঁক দিয়া নিবিষ্টচিত্তে আমি তাহাদিগকে দেখিতেছিলাম : তখন যেন তাহাদিগকে দেখিতে আমার কেমন ভাল লাগিতেছিল। কেহ হয় ত মনে করিবেন একে ব্রাহ্মণের ছেলে, তায় ক্ষুধার জ্বালা ; খাবার হাতে কাহাকেও দেখিলে ত ভাল লাগিবারই কথা। সে কথা সত্য বটে ; কিন্তু শুধু তাই নয় ; উহাদের ভাবের অভিনয়টাও আমার তখন ভালই লাগিতেছিল। যাহা হউক, খাবারের আয়োজন দেখিয়া বৈষ্ণবীমা বাবাজীকে বলিয়া উঠিল, 'ওরে ও হাভাতে ? এত খাবার কি হবে রে ?—এত সব কেন এনেছিস্ ?'

'সাধুদের খাওয়াতে হবে' বলিয়া বাবাজী খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া প্রত্যেক নাগা সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া একবার মনে হইল,—তাইত !

ওদের মত ত্রৈলঙ্গস্বামী সেজে বসে পড়্‌ব নাকি ? তাহলে হয়ত বাবাজী আমাকেও সাধ্‌তে পারে।' আবার কি ভাবিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সন্ন্যাসীরা সকলেই বাবাজীকে উপেক্ষা করিল : তাহারা কেহই তখনও অভুক্ত নাই এবং দ্বিতীয়বার খাইবার লোভও কেহ করিল না। বৈষ্ণবীমা বলিল, 'তোর হাতের খাবার কে খাবে রে হতভাগা ? এত বড় হলি এখনও এটুকু বুদ্ধি হল না ? দিন দিন ত খুব কথা শিখ্‌ছিস ; এ বিবেচনা তোর নেই ?'

বাবাজী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করিয়া বলিল, 'ওলো, ও ঢেম্‌নি, দেখ্‌ দেখি ঐ কে ওখানে শুয়ে আছে ? বোধ হয় রাধানাথ আজ ওর জন্যেই এত খাবার আনিয়েছেন।'

যেমন কথা অমনই কাজ। তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবীমা আমার কাছে আসিয়া আমায় ডাকিয়া বলিল, 'কে বাবা শুয়ে আছ ? কিছু খাবে কি ?'

আমি ত হাতে স্বর্গ পাইলাম। তথাপি যেন কিছুই জানি না এই ভাবে ধীরে ধীরে মস্তক অনাবৃত করিয়া চমকিতভাবে উঠিয়া বসিলাম এবং 'কে আপনি ?—কি বল্‌ছেন ?' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলাম। আমার মুখে বাংলা কথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে বাবাজীর উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবীমা বলিয়া উঠিল, 'ওরে ও মিন্‌সে! আয় আয় দেখে যা, কেমন নবীন সন্ন্যাসীর দর্শন পেয়েছি।'

বাবাজী তাড়াতাড়ি খাবারের ঠোঙ্গা হাতে করিয়া আমার কাছে আসিল এবং কিছুক্ষণ আমার পানে তাকাইয়া বৈষ্ণবীমাকে বলিল, 'তবে আর কি—এই যে তোর ছেলেকে খেতে দে!'

বাবাজীর হাত হইতে খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া বৈষ্ণবীমা, 'বাবা, কিছু খাবে ত ?' বলিয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। মায়ের সেই স্নেহকোমল পবিত্র দৃষ্টি ক্রমে অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল ; দেখিতে দেখিতে মুক্তার মত দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া খাবারের ঠোঙ্গায় পড়িতেই মা আমার হাসিমুখে জিভ কাটিলেন আর আমার মনে হইল যেন আমি মা আদ্যাশক্তির হাস্যময়ী জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতেছি। সে যাহা হউক আমি আর বিলম্ব না করিয়া অকপটে বলিয়া ফেলিলাম, 'দাও মা, খেতে দাও, আমি সত্যই ক্ষুধার্ত্ত।'

মা আমায় খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রথমেই তরকারী সহযোগে সেই বড় বড় কচুরী খাওয়াইলেন ; তারপর মিঠাই। আবার আমি খাইতে খাইতে বাবাজী ছুটিয়া গিয়া রাবড়ি

লইয়া আসিলেন এবং আমার পাত্রে প্রায় এক পোয়া আন্দাজ রাবড়ি ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'সাধু, সব খেতে হবে ; কিছু ফেলতে পারবে না।' আমিও ওজর আপত্তি না করিয়া সমস্ত খাবারগুলি নিঃশেষ করিয়া যমুনায় মুখ ধুইতে গেলাম ; ইত্যবসরে তাঁহারা কিছু দূরে তাঁহাদের আসন করিয়াছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তাঁহারা সেখানে রঙ্গরসে পানভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; মনে হইল, আমি বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয় তাঁহারা লজ্জায় দূরে সরিয়া গেলেন। আমিও তৃপ্তহৃদয়ে 'জয়গুরু' বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। তেমন সুনিদ্রা বোধ হয় জীবনে আর হয় নাই ; এমন সময় এ আবার কোন ভাবের অভিব্যক্তি! আমি যেন দেখিতেছি, সেই কূয়ার ধারে যাঁহারা আমায় জলপান করাইয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সাজিয়া আমায় আহার করাইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিবামাত্র আমি জাগ্রত হইলাম ; তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যেদিকে বসিয়াছিল সেইদিকে তাকাইলাম ; কিন্তু কই? তাহারা কোথায় গেল? হায়! এ কি হইল! এ কি দেখিলাম! এ যে শূন্যময় দেখিতেছি! আসন শূন্য, স্থান শূন্য, আমার হৃদয় পর্য্যন্ত শূন্য করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া গেল? তখনও প্রায় এক ঘণ্টার উপর রাত্রি আছে ; আমি ক্ষিপ্রহস্তে আসন উঠাইয়া সেইস্থানে গিয়া দেখি, সেখানে কেবলমাত্র একখানি পাতলা গৈরিকরঞ্জিত চাদর বিছান রহিয়াছে ; আর কোথাও কোন চিহ্ন নাই ; এমন কি সেই চাদরের উপর কেহ বসিয়াছে বা শুইয়াছে এমন কোন নিদর্শনও সেখানে পাইলাম না।

মনটা খারাপ হইয়া গেল ; ব্যাপার কি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া আমি যমুনাতট পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনবাজার হইতে এক গাছি দড়ি সংগ্রহ করিয়া সেই কূয়া অভিমুখে চলিলাম। যথাসময়ে কূয়ার ধারে উপস্থিত হইয়া আমার সেই শতছিদ্র কমণ্ডলুতে দড়ি বাঁধিয়া জল তুলিলাম। জল তুলিয়া এক অঞ্জলি মুখে দিতেই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। একি সেই জল! এ যে লবণাক্ত পচা দুর্গন্ধ জল! কার সাধ্য এ জল গলাধঃকরণ করে? হায়! অভাগা অজ্ঞান জীব! বার বার দুই বারেও তোর চৈতন্য হইল না! হাতে পাইয়াও ধরিতে পারিলি না!

দুঃখে হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল ; বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাইতে লাগিল ; ক্রমে আমি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকভাঙ্গা আকুল ক্রন্দনের হাহাকারে সেস্থান যেন মরুশ্মশানে পরিণত হইল। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে শুধু বলিতে লাগিলাম, 'প্রাণবল্লভ!

যদি দেখাই দিলে, তবে এমন করে ফাঁকি দিলে কেন?' বহুক্ষণ এইরূপ কান্নাকাটির পর কখন যে আমি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি কিছুই জানি না; অকস্মাৎ দেখি আবার যেন তাঁহারা আসিয়াছেন। আবার প্রাণবল্লভ প্রাণসখা প্রাণের প্রাণ ভুবনমোহন রূপে আমার কাছে আসিয়াছেন। আহা! সে কি আনন্দময় মূর্ত্তি! কি স্নিগ্ধ মধুর ভাব! আমায় আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'অন্নদা, কেন কাঁদ্‌ছিস্? আমাদের স্বরূপ যদি তুই বুঝ্‌তে পারতিস্ তাহলে যে তোর শরীর থাক্‌ত না; তোর শরীর দিয়ে যে আমার অনেক কাজ করিয়ে নিতে হবে; তাই তোকে কিছু জান্‌তে দিইনি; তুই কোন দুঃখ করিস্ নি।'

আহা সে কি অমৃতময়ী বাণী! সে কি আশা কি আশ্বাসের বাণী! নিমিষের মধ্যে যেন আমার সমস্ত বেদনা দূর হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেই ভুবনমোহন রূপ আকাশের গায়ে মিলাইয়া গেল। আমি যেন যাদুমন্ত্রের গুণে আনন্দময় হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলাম। জাগিয়া দেখি আর আমার চিত্তে কোন ক্ষোভ নাই, চাঞ্চল্য নাই; দুঃখ বা অবসাদ কিছুই নাই; আমি আবার সেই পুরাতন ভাব ফিরিয়া পাইয়াছি। সেই স্বপ্নাদেশের কথা আবার আমার স্মরণ হইল। ঝুলন পূর্ণিমায় আমাকে লছমনঝোলায় উপস্থিত হইতে হইবে এই সঙ্কল্প আমায় আবার সতেজ করিয়া তুলিল। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সমস্ত ঘটনা যত্নে রাখিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অতঃপর আরও দুই রাত্রি বৃন্দাবনে পরম আনন্দে কাটাইয়া হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

হরিদ্বার হইতে লছমনঝোলার পথে শ্রীশ্রী৺ অন্নদাঠাকুর মহাশয়কে ভগবান এক ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যে অমানুষিক ধৈর্য্য ও সংযম সহকারে ঠাকুর মহাশয় সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁহার 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থে বর্ণিত সেই বিবরণপাঠে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন যে একমাত্র ঐরূপ আধারেই ভগবানের কার্য্যভার ন্যস্ত হওয়া সম্ভব। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেই ঘটনার বিবরণ এই স্থানে দেওয়া হইল না। পিপাসু পাঠক 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থ হইতে সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ পাঠ করিবেন।

আদেশবাণী

ঝুলন পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় লছমন-ঝোলার স্বর্গাশ্রমে উপনীত হইলেন। জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর কুঠিয়ায় সেই সেই রাত্রি কাটাইয়া তাঁহারই সাহায্যে পরদিবস ঝুলন পূর্ণিমার দিন তিনি একখানি পৃথক কুঠিয়া অধিকার করিলেন। সঙ্গের সাথী একখানি যুগল মূর্ত্তি ফলফুলে সাজাইয়া তাহারই সেবা পূজায় সারাদিন অতিবাহিত হইল; ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, 'না জানি আজ আবার কি আদেশ হয়' ভাবিতে ভাবিতে নিশাগমে কম্বলশয্যা আশ্রয়পূর্ব্বক তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রেই সেই আদেশবাণী, জীবহিতে ভগবানের সেই অপার করুণা শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুরের উপর বর্ষিত হয়। আদেশের আমূল বৃত্তান্ত ঠাকুর মহাশয়ের 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ঠাকুর লিখিয়াছেন—

আজ আমার জীবনের এক শুভদিন। আমার নরজীবন ধন্য করিতে আজ নর নারায়ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই দীনহীনের কুঠিয়ায় আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের মুখ প্রফুল্ল; যেন ইসারায় বলিতেছেন, 'অন্নদা, উঠে এস।' আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে যখনই ঠাকুর স্বপ্নে আমার কাছে আসেন, তখনই মনে হয় যেন তিনি আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু; কোন পূজনীয় গুরুজন বা আরাধ্য দেবতা নন। যখন আসেন তখন বন্ধুভাবে বেশ থাকি; ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে হায় হায় করি; একবার অভিবাদন পর্য্যন্ত করিলাম না ভাবিয়া জ্বালা অনুভব করি; নিজ আচরণে সহস্র ধিক্কার দিই। যাহা হউক আজ এই যে জাগ্রতের মত ঠাকুরের সঙ্গে চলিয়াছি, তাঁহার নির্দ্দেশমত নবনির্ম্মিত একটী কূয়ার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহাতেও আমার চৈতন্য হইল না। ঠাকুর তখন বলিলেন, 'এখানে বড় ঠাণ্ডা; একটু আগে জল হয়ে গেছে; তুমি এক কাজ কর; কুঠিয়া থেকে তোমার কম্বল আসনখানা নিয়ে এস।'

তৎক্ষণাৎ কুঠিয়ায় গিয়া কম্বল আসন লইয়া আসিলাম এবং তাঁহার আদেশে সেই কূয়ার ধারে পাতিয়া সেখানে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। ঠাকুরও আমার সম্মুখে মাথার কাছে বসিয়া বলিলেন, 'অন্নদা, আজ তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত ; তা তুমি বুঝ্‌তে পারছ কি? যদি তুমি আমার সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছা কর, তাহলে চল ; তোমার সমস্ত দুঃখের অবসান হবে।' তারপর আবার বলিলেন, 'তুমি বিশেষ করে ভেবে দেখ,—আমার সঙ্গে চলে যাওয়া? না, সংসারে থাকা? কোনটা তোমার সুখের হবে? যদি তুমি সংসারে থাক্‌তে চাও, আমি তোমায় কিছু আয়ুও দিয়ে যেতে পারি।'

মৃত্যুর কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিশেষ চিন্তার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে এই জ্বালাময় সংসারে বদ্ধ থাকা অপেক্ষা ঠাকুরের সঙ্গে যাওয়াই মঙ্গল। সংসারে জীব কি অসহ্য দুঃখই না ভোগ করিতেছে! রোগে শোকে পাপে তাপে জীবনটা কি হাহাকারময়ই না করিয়া তুলিতেছে! দিনান্তে একবার বিমল আনন্দে ভগবানকে স্মরণ করিতে পারে এমন স্বাধীনতা পর্য্যন্ত জীবের নাই!—সংসারে কি আছে? আছে শুধু রোগীর আর্ত্ত চীৎকার, শোকের মর্ম্মভেদী হাহাকার, দুর্ভিক্ষের পৈশাচিক নৃত্য ; তার উপর আবার আত্মীয়ের অসহ্য গঞ্জনা, প্রবলের অদম্য অত্যাচার, সমাজের নির্ম্মম পীড়ন ; আর সবার উপরে আছে পরাধীনতার দুর্ব্বহ শৃঙ্খলভার। এই জ্বালাময় সংসারে কে থাকিতে চায়? এ সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুরকে বলিলাম 'ঠাকুর! আমায় নিয়ে চল ; আমি আর এই বন্ধনের ভেতর থাক্‌তে চাই না।'

আমি যখন এই সকল চিন্তা করিতেছিলাম তখন যে ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমি ঠাকুরের সহিত যাওয়াই সঙ্কল্প করিয়াছি শুনিয়া ঠাকুর যেন বিস্মিত হইয়াই বলিলেন, 'যাওয়াই ঠিক হল? তা বেশ ;—আচ্ছা, আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ দেখি?'

ভাবিতে গিয়া দেখি আমার সম্মুখে কিছু দূরে সহস্র সহস্র লোক যেন করুণ কটাক্ষে আমার পানে তাকাইয়া আছে। উহাদিগের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হওয়ামাত্র উহারা মিনতিপূর্ণ বাক্যে অনুরোধ করিতে লাগিল, আমি যেন একাকী না চলিয়া যাই। উহাদের মধ্যে আমার সংসার সম্বন্ধে কোন আত্মীয়ই ছিলেন না ; পরিচিতের মধ্যে দুই চারিজন

বন্ধুবান্ধব ছিলেন মাত্র ; আর সকলেই অপরিচিত। সকলকে দেখিয়াই বড় দুঃখী বলিয়া বোধ হইল। এই কাতর দৃশ্য ক্রমশঃ আমার ক্ষুদ্র হৃদয় গ্রাস করিয়া ফেলিল ; অজ্ঞাতসারে আমার ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল। আমি উহাদের কাতরতা দেখিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঠাকুর ! ওদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না ?'

ঠাকুর বলিলেন, 'অসম্ভব ; ওদের এখনও অনেক কর্ম্ম বাকী ; ওরা কেমন করে তোমার সঙ্গে যাবে ?'

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম এবং উহাদের অনেক দুঃখের কথা ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলাম, 'কি উপায়ে এই অসম্ভব সম্ভব হয়, আমায় তাই বলে দাও ঠাকুর ! আমি জীবন পণ করে তাই করব।'

ঠাকুর অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'অসম্ভব—অসম্ভব ; সে সময় আসতে এখনও এক শ বৎসর দেরী আছে ; তুমি ও সঙ্কল্প ছাড়।'

আমি বলিলাম 'তা হবে না ঠাকুর ! ঐ এক শ বৎসরকে ঘুরিয়ে ওর শেষের দিকটা আগে নিয়ে আসতে হবে ; তার জন্যে কি করতে হবে বল। এ তোমাকে করতেই হবে। ঐ শোন ঠাকুর ! নিরন্নের কাতর ক্রন্দন, আর্ত্তের মর্ম্মভেদী হাহাকার ; ঐ দেখ ত্রিতাপদগ্ধ জীব আকুল আহ্বানে ভগবানের আসন টলাতে বদ্ধপরিকর হয়েছে ; ভগবানের সন্ধানে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে ; তাঁর পূজার জন্য যথাসর্ব্বস্ব নিয়োগ করতে ব্যাকুল হয়েছে। আর নির্দ্দয় হয়ো না ঠাকুর !—আর ওদের মোহে ফেলে রেখো না। ওরা অনেক শাস্তি পেয়েছে ; কর্ম্মের ফলে অনেক দুঃখ কষ্ট সয়েছে ; অনেক জ্বালায় ওরা জ্বলছে ;—আর ওদের কষ্ট দিও না ঠাকুর ! ওদের পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। আর কেন ? পতিতপাবন ! এবার পতিতকে দয়া কর প্রভু ! বিপন্নবারণ ! বিপদ থেকে ওদের উদ্ধার কর !—সব যে যায় ; ধর্ম্ম কর্ম্ম মনুষ্যত্ব সব যে যেতে বসেছে !—আর বিমুখ হয়ো না ঠাকুর ! একবার ওদের দিকে ফিরে চাও ;—বল কি করলে ওদের বন্ধন ঘোচে—কর্ম্ম শেষ হয়—ওরা তোমার কাছে যেতে পারে।'

আমার অনুনয়ে ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'অন্নদা, তুমি যা চাইছ তা করতে হলে তোমাকে বিশ বৎসর সাধনা করতে হবে। দশ বৎসর সংসারে থেকে বাপ মার সেবা ; আর দশ বৎসর সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে থেকে

* * * এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ কর্‌তে হবে; কঠোর নিয়মের মধ্যে থেকে মন্ত্রশক্তিকে জাগাতে হবে; পার্‌বে ত?'

আমি তখন নীরব। ঠাকুর আবার বলিলেন, 'যা বল্‌লুম তা যদি কর্‌তে পার ত তোমার ওপর আর একটি শক্ত কাজের ভার পড়্‌বে। বল;—আমার কথার উত্তর দাও;—পার্‌বে?'

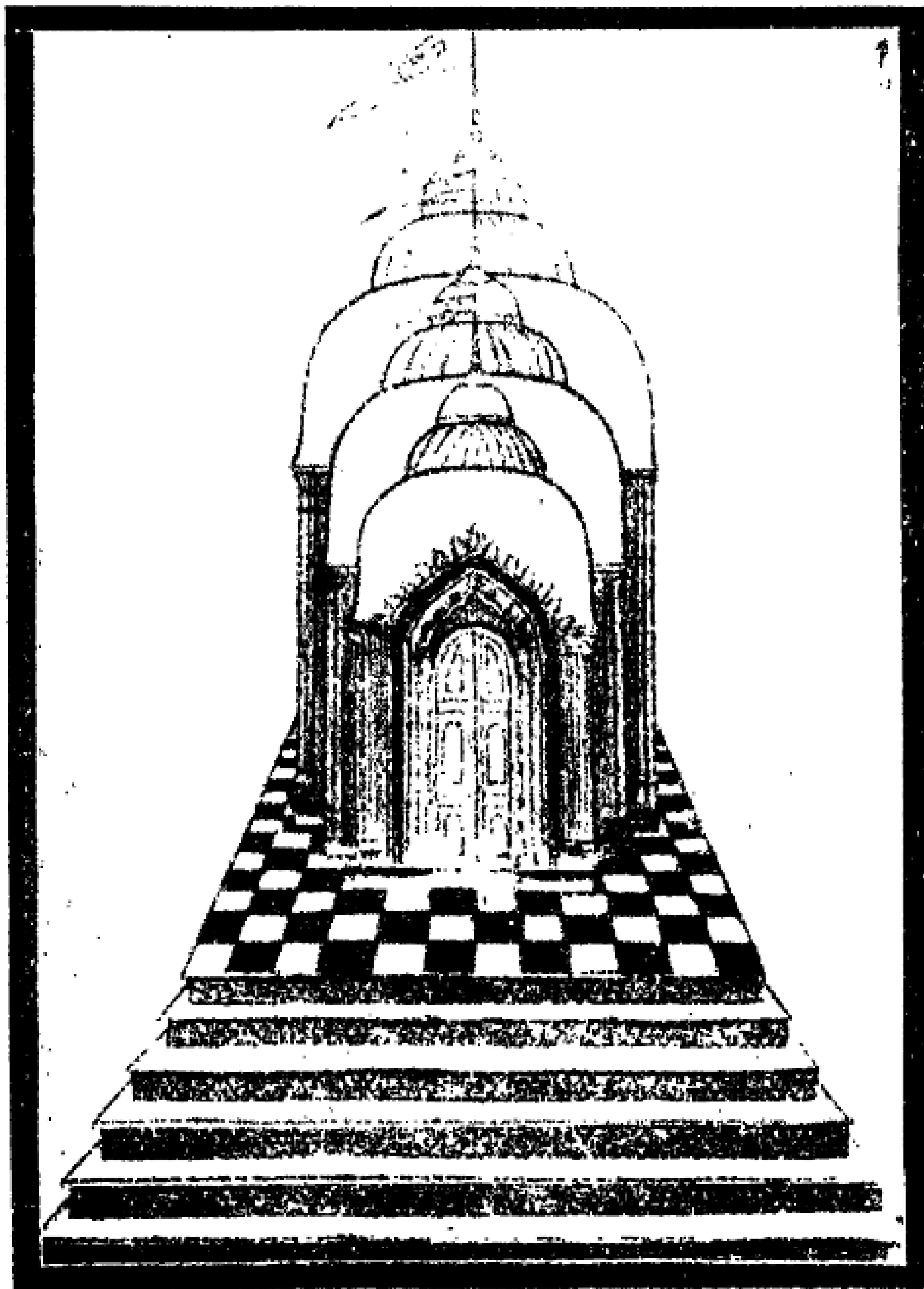
এবার আমি বলিলাম, 'ঠাকুর! এত লোকের যদি সামান্য উপকারও হয়, আমি বিশ বৎসর সাধনা কর্‌তে প্রস্তুত আছি; বলুন বিশ বৎসর পরে আবার কি কঠিন কাজের ভার আমার ওপর পড়্‌বে?'

ঠাকুর বলিলেন, 'সেই কঠিন কাজ হচ্ছে, একটী মন্দির স্থাপন;—যে মন্দির স্থাপনের পর দেশে এক অপূর্ব্ব ভাবের অভিনয় হবে, সেই মন্দির স্থাপন;—যে মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান আছেন,—তাঁকে দেখা যায়,—যেমন করে তোমার সঙ্গে কথা কইছি—এমনি করে তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, এইরূপ বিশ্বাস সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্তরে জেগে দেশে এক নব জাগরণ নিয়ে আস্‌বে, সেই মন্দির স্থাপন। বল, পারবে?'

আমি আনন্দের সহিত বলিলাম, 'নিশ্চয় পার্‌ব; বলুন, সে মন্দির কি রকম হবে।'

ঠাকুর তখন আমাকে পাহাড়ের গায়ে এক একটী করিয়া তিনটী মন্দির দেখাইলেন।—প্রথম মন্দিরটী একটী অতিকায় হংসপৃষ্ঠোপরি অবস্থিত; মন্দিরের চূড়া স্বর্ণময়; প্রাচীর বহুমূল্য রত্নরাজি খচিত; মন্দিরমধ্যে বেদীর উপর পরমহংসদেবেরই একটী সজীব প্রতিমূর্ত্তি।—প্রথম মন্দিরের পার্শ্বেই দ্বিতীয় মন্দির। মন্দিরটী শবরূপী শিবের বক্ষোপরি অবস্থিত; যে আদ্যামূর্ত্তি কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে পাওয়া গিয়াছিল সেই আদ্যামায়ের জীবন্ত মূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে দাঁড়াইয়া যেন মৃদু হাসিতেছে।—তৃতীয় মন্দিরটী গরুড়ের পৃষ্ঠে অবস্থিত। ঐশ্বর্য্যে ইহাও প্রথম দুইটীর অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়; মন্দিরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের জীবন্ত যুগলমূর্ত্তি প্রণবের মধ্যে শোভা পাইতেছে। তিনটী মন্দিরই পরস্পর সংলগ্ন।

স্তব্ধদৃষ্টিতে মন্দিরগুলি দেখিয়া আমি বলিলাম, 'ঠাকুর! পৃথিবীতে এমন মন্দির নির্ম্মাণ করা কি মানুষের সাধ্য? এমন মন্দির কেবল ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোকেই



আদিষ্ট মন্দিরের আভাস (বহির্ভাগ)



আদিষ্ট মন্দিরের আভাস (অন্তরভাগ)

শোভা পায়। আমার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর এ ভার দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? আমার পক্ষে কি একাজ কখনও সম্ভব?'

তখন ঠাকুর আমায় আর একটী মন্দির দেখাইলেন। এই মন্দিরের তিনটী চূড়া; একটীর পিছনে কিঞ্চিৎ উচ্চে আর একটী করিয়া নির্ম্মিত; দেখিলে মনে হয় যেনএকটি বৃহৎ মন্দিরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন আর একটি মন্দির কতকটা প্রবেশ করিয়াছে; তাহার মধ্যে আবার আর একটী অর্থাৎ সম্মুখের ছোট মন্দিরটী কতকটা প্রবেশ করিয়া যেন সংযোগ সম্বন্ধে ত্রিমন্দিরের এক অভিনব সমাবেশে মন্দির স্থাপত্যে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে। মন্দির মধ্যে তিনটী বিভাগ সোপানশ্রেণীর আকারে সজ্জিত। প্রথম বিভাগে বেদীর উপর পরমহংসদেবের মূর্ত্তি। পদতলে বেদীগাত্রে লিখিত আছে—'গুরু'। মধ্যম বিভাগে পূর্ব্বকথিত আদ্যামূর্ত্তি; মূর্ত্তির নিম্নে বেদীগাত্রে লিখিত রহিয়াছে—'জ্ঞান ও ভক্তি'। শেষ বিভাগে প্রণবের মধ্যে ৺রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি; মূর্ত্তির পাদমূলে বেদীগাত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে 'প্রেম' এই কথাটী লেখা রহিয়াছে। মূর্ত্তিত্রয় এমনভাবে স্থাপিত রহিয়াছে যে মন্দিরদ্বারের বাহির হইতে ত্রিমূর্ত্তি একত্র সুন্দরভাবে দর্শন করা যায়। মন্দিরটী বড়ই সুদর্শন; দেখিয়া মনে হইল মর্ম্মর নির্ম্মিত।

ইহার পর ঠাকুর একবার আমার মুখের পানে তাকাইয়া আর একটী মন্দির আমায় দেখাইলেন। এ মন্দিরটী সাধারণ শ্রেণীর; ইহার পাশাপাশি তিনটী দ্বার; ভিতরে পাশাপাশি তিনটী বেদীর উপর পুর্ব্বোক্ত ত্রিমূর্ত্তি স্থাপিত; উপরে পাশাপাশি তিনটী চূড়া।

এইরূপে তিন দফায় আমাকে তিন প্রকার মন্দির দেখাইয়া ঠাকুর বলিলেন, 'অন্নদা, দ্বিতীয়বারে তোমায় যে মন্দির দেখিয়েছি, তা তুমি নির্ম্মাণ করতে পারবে; যদি তুমি এ ভার নিতে স্বীকার কর ত বল আমি তোমায় সমস্ত খুলে বলি।'

আমি উত্তর করিলাম, 'আপনি যদি শক্তি দেন, আমি নিশ্চয়ই মন্দির স্থাপন করতে পারব।'

ঠাকুর প্রফুল্ল বদনে যেন আমায় অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে বলিলেন, 'অন্নদা, তুমি যখন জগতের মঙ্গলের জন্য এরূপ কঠোর ভার বহন করতে প্রস্তুত, তখন বলি শোন; তোমার কোন ভয় নেই; আমার দেহরক্ষার বত্রিশ বৎসর

পরে আমি আবার বাংলায় যাচ্ছি; সেই দেহরক্ষার সত্তর বৎসর পরে আবার যাব; এই ভাবে আমি আরো এগারবার অবতীর্ণ হব। যতদিন না বাংলার জনসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ততদিন আমায় এইভাবে যেতে হবে। তুমি কিছু ভেবো না; আমার আটজন অন্তরঙ্গ ভক্ত তোমার মন্দিরের কাজে জীবনপাত কর্‌বে; আর আমার গত বারের আঠার জন ভক্ত এক শ আঠাশটী শরীর চালনা করে তোমার কাজের সহায়তা কর্‌তে আবার বাঙ্গলায় যাচ্ছে। বিবেকানন্দ একটী ব্রাহ্মণ, একটী কায়স্থ ও একটী বৈদ্য এই তিনজনের ভিতর দিয়ে কাজ কর্‌বে; রামদত্ত দুজনের ভিতর দিয়ে কাজ কর্‌বে; এইভাবে আঠার জন ভক্ত কাজ কর্‌বে। তোমার ভয় কি?'

ইহার পর উক্ত মন্দির কোথায় স্থাপন করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, 'মন্দিরটী বাংলাদেশেই—৺কালীঘাটের নকুলেশ্বর শিবের মন্দির থেকে আরিয়াদহের ৺দক্ষিণেশ্বর শিবের মধ্যবর্ত্তী এই কালীস্থানে স্থাপিত হবে। এই মন্দির স্থাপনের পর দেশ এক মহা ধর্ম্মভাবের বন্যায় প্লাবিত হতে থাক্‌বে। লোকের প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে ভগবান যে কেবল আছেন, শুধু তাই নয়; তাঁকে দেখা যায়। এমন কি প্রতি বৎসর অন্ততঃপক্ষে তিন জন ভাগ্যবান ভক্ত এই মন্দিরেই ভগবানের প্রকট দর্শন লাভ করে জগতের মঙ্গল কার্য্যে জীবন উৎসর্গ কর্‌বে।'

আমি আনন্দে আত্মহারা। সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মন্দিরের দৈনন্দিন কাজ কি ভাবে চল্‌বে?'

ঠাকুর বলিলেন, 'দৈনন্দিন মঙ্গল আরতির পর প্রাতে পূজা ও ভোগরাগাদি হলে পরে আরতি দিয়ে মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হবে। তারপর অপরাহ্নে পুরাণ ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা; সন্ধ্যায় কীর্ত্তন; রাত্রে শীতল আরতির পর দুয়ার বন্ধ।—আর দেখ, এই মন্দিরে ঠাকুর দর্শনের একটা নিয়ম থাক্‌বে। সাধারণতঃ প্রত্যহ শুধু আরতির সময় মাত্র

সকলে দর্শন করতে পারবে ; তাছাড়া বৎসরের মধ্যে শুক্লা নবমী কৃষ্ণা একাদশী প্রভৃতি বাছায় তিথিতে সারাদিন সাধারণের দর্শনের জন্য মন্দির খোলা থাকবে।—আর দেখ, স্ত্রী ও পুরুষের দর্শনের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা থাকবে।'

ঠাকুর আরও বলিলেন, 'মন্দিরের অধীনে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক দুটি আশ্রম স্থাপন করতে হবে। একটী পুরুষ সাধকদের জন্য ; আর একটী সাধনপথ অবলম্বন করতে চান এমন স্ত্রীলোকদের জন্য ; তাছাড়া মন্দিরের আয় থেকে আরও চারটী কাজ করতে হবে।—

১। বালকদিগের শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্থাপন।

২। বালিকাদিগকে আর্য্যনারীর আদর্শে শিক্ষাদান।

৩। সংসারবিরাগী গৃহস্থের জন্য বাণপ্রস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা।

৪। সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ চেষ্টা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, মন্দিরে ভোগের কিরূপ ব্যবস্থা করা হবে?'

ঠাকুর বলিলেন, 'তিন দেবতার সাড়ে বার সের, সাড়ে বাইশ সের, আর সাড়ে বত্রিশ সের চালের ভোগ দেওয়া হবে ; পঞ্চ ব্যঞ্জনে সেই ভোগ উৎসর্গ করে আশ্রমের লোকজন ও দীন দুখীকে প্রসাদ দেওয়া হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমান্ন ভোগও থাকবে কি?'

'থাকবে বই কি ; যথাক্রমে পাঁচ পো, আড়াই সের, আর সাড়ে তিন সের দুধের পরমান্নভোগ নিত্য হবে ; তাছাড়া শয়ন আরতির পূর্ব্বে একটী ভোগ দিতে হবে ; সে কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি। অন্ততঃ পাঁচ পো ঘি, আড়াই পো কিস্‌মিস্, পাঁচ ছটাক বাদাম পেস্তা দারচিনি তেজপাতা লবঙ্গ, আর সাত পো চিনি দিয়ে আড়াই সের উৎকৃষ্ট সুগন্ধ চালের ভোগ প্রস্তুত করে জাফরাণ দিয়ে রং করে নিতে হবে।

এই ভাবে 'অমৃতভোগ' প্রস্তুত করে প্রত্যহ তিন দেবতাকে উৎসর্গ করে দিতে হবে।'

'আচ্ছা' প্রত্যেক দিন যে এত ভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে সব কোথায় সাজিয়ে দেওয়া হবে ?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'অমৃতভোগ ও পরমান্নভোগ মন্দিরেই দেওয়া হবে ; তা ছাড়া দুপরের অন্নভোগের জন্য পৃথক ভোগালয় কর্‌তে হবে ; সেই ভোগালয় থেকে যেন মূর্ত্তি দর্শন হয়। সেই ভোগালয়েই ভোগ সাজিয়ে দেওয়া হবে।'

'এ সব বৃহৎ ব্যাপার ; ঠিক্ ঠিক্ হবে কি ?'

নিশ্চয় হবে ; আমার কথা কথনও মিথ্যা হবার নয়। তুমি নিশ্চয় জেনো যে সৃষ্টির পর এ রকম ব্যাপার পৃথিবীতে এই প্রথম ; এমন সুযোগ, জীবহিতে এমন কৃপা, আর কখনও হয়নি। এখন এমন কোন স্থান নেই যেখানে ভগবানের প্রকট আবির্ভাব সম্ভব ; যে দুএকটী স্থান নাম মাত্র আছে তাও ক্রমে কালের গর্ভে লীন হয়ে যাবে। থাকবে শুধু বাংলায় ঐ পীঠস্থান। কলির দুর্ব্বল জীবকে আবার সবল ও ধর্ম্ম পরায়ণ করে ভগবানের সেবায় লাগাবার জন্যই আজ এই কাজের সূচনা করা হল ; তুমি কখনও মনে স্থান দিও না যে এই কাজ জীবভাব প্রসূত ; দেবতার ইচ্ছায় এই কাজ সম্পন্ন হবে ; জীব নিমিত্তমাত্র। বাংলাকে অবিশ্বাস করো না ;— বাংলা এখনও আধ্যাত্মিকতা হারায় নি ;— এখনও ভগবানকে বাদ দিয়ে নিজে ভগবান সাজ্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি বাংলার হয় নি ;—এখনও বাংলার আকাশে বাতাসে ভক্তির বীজ ছড়ান রয়েছে ;—এই বাংলাই এখন এমন পবিত্র কাজে সাড়া দেবার মত একমাত্র দেশ। বাংলায় এখনও দাতা ভক্তের অভাব হয় নি ; তবে তুমি নিমিত্ত কারণ বলে তোমাকেও নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে। তোমার উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যাবে ;

তোমায় তাতে স্থির ধীর অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে; শুধু দেখ্‌বে, প্রকৃতির নিয়মে কত লোক আস্‌বে কত লোক যাবে; যার কাছে যা সাহায্য পাও তাই যথেষ্ট মনে করে তার উপর সন্তুষ্ট থাক্‌বে। তুমি ছাড়া আর যে ছাব্বিশ জন সহকর্ম্মীর কথা তোমায় আগে বলেছি, মন্দিরের কাজে তাদেরও চোখের জল পড়্‌বে; সহকর্ম্মীরা সম্ভবমত দেশ কাল পাত্র অনুসারে তোমাকে এই কাজে সাহায্য করবে। তোমার সাধনার পর বার বৎসরের মধ্যেই মন্দিরের কাজ আরম্ভ হবে; যদি সেই বার বৎসরের মধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হয়, তাহলে দর্শক সাধারণকে মন্দির স্পর্শ কর্‌বার অধিকার দিও; নাহলে মন্দিরের চারিদিকে এমন কঠিন বেষ্টনী রাখ্‌বে যে সেবায়েৎ পূজারী ভিন্ন সাধারণ লোক যেন মন্দির স্পর্শ কর্‌তে না পারে।'

'সে কি ঠাকুর? সাধুরাও নয়?'

'তুমি সাধু কাকে বল্‌ছ? জটা রেখে যারা গেরুয়া পরে বেড়ায় আর চিম্‌টে ভস্মের সদ্ব্যবহার করে, তাদেরই সাধু বল্‌ছ ত? দেখ, সে জাতের সাধুদের মধ্যে প্রকৃত সাধু খুব কম পাবে; প্রকৃত সাধু বরং গার্হস্থ্য আশ্রমেই আছে; এযে ঘোর কলিকাল; একথা ভুলো না। কাজেই সাধুবেশীকেও মন্দির স্পর্শ কর্‌বার অধিকার দেওয়া হবে না। আর যদি বার বৎসরের মধ্যে মন্দির হয়ে যায় ত মনে কর্‌বে দেশে একটা মহা সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে; যে মন্দিরে ভগবানের প্রকট আবির্ভাব, দেশবাসী আজ সেই মন্দির স্পর্শ কর্‌বার উপযুক্ত হয়েছে; দেশ ধন্য হয়েছে।'

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন যে মন্দিরে পূজারী ভিন্ন অন্যান্য লোকজন না হলে চল্‌বে না; তখন কি করা যাবে?'

'প্রতিষ্ঠার দিন কোন নিয়ম থাক্‌বে না।'

'যারা উপস্থিত থাক্‌বে সকলে স্পর্শ কর্‌তে পারবে?'

'হাঁ; পার্‌বে।'

'আচ্ছা তিন দেবতার কি তিন জনই পূজারী থাক্‌বে? আর কেবল তাদেরই মন্দিরের ভেতরে যাবার অধিকার থাক্‌বে?'

'তার কোন মানে নেই; পূজারী যত জন দরকার হয়, থাক্‌তে পারে; তার কোন সংখ্যা নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো যে এই মন্দিরের মোহান্ত বলে কেউ থাক্‌বে না; মন্দিরের কাজ যাতে সুশৃঙ্খলায় যথারীতি চলে শুধু তাই দেখ্‌বার জন্য দুই বৎসরের মত মন্দিরের অধীন আশ্রম থেকে এক এক জন সাধুর উপর ভার দেওয়া হবে। উপযুক্তভাবে কাজ চালালে একই জনের উপর একাধিক বার ভার দেওয়া যেতে পার্‌বে; তাতে কোন দোষ হবে না।'

'আচ্ছা, আপনি সাধারণের দর্শনের জন্য যে বাহান্ন দিনের কথা বলেছেন, সে কোন কোন দিন?'

'হাঁ; ভাল কথা মনে করেছ; শোন,—শুক্লপক্ষের নবমী ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশী বৎসরে ২৪ দিন; ঝুলনপূর্ণিমা, রাসপূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা ও লক্ষ্মপূর্ণিমার ৪ দিন; মহালয়া ও দীপান্বিতা অমাবস্যা ২ দিন; জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী ২দিন; শ্রীপঞ্চমী ও নাগপঞ্চমী ২দিন; সংক্রান্তি ১২দিন; শারদীয়া দুর্গাপূজা ও বাসন্তীপূজার সপ্তমী অষ্টমী ও দশমী এই তিন দিন করে ৬দিন;—মোট ৫২দিন।'

'যদি এই সমস্ত পর্ব্বতিথি একদিনে দুটী পড়ে, তাহলে ত ৫২ দিনের কম হবে? তখন কি করা যাবে?'

'সে রকম হলে তার পরের শুক্লা একাদশীতেও মন্দির খোলা থাক্‌বে।'

'মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি কত বড় হবে? আর কি কি উপাদানেই বা প্রস্তুত হবে?'

'গুরুমূর্ত্তি—উপবিষ্ট প্রমাণ মানুষের মূর্ত্তির মতই হবে; কাঠের, পাথরের, ধাতুর বা মাটীর মূর্ত্তি হলেও চল্‌বে। আদ্যামূর্ত্তি—আট বৎসরের কুমারীর মত অষ্টধাতুর মূর্ত্তি করতে হবে। আর প্রণবমধ্যস্থ যুগলমূর্ত্তি—বার বৎসরের ছেলে মেয়ের মত হবে; এবং গুরুমূর্ত্তির মত যে কোন উপাদানে প্রস্তুত কর্‌লেই চল্‌বে।'

'আচ্ছা, আপনি বল্লেন,—গত বারের দেহরক্ষার বত্রিশ বৎসর পরে আপনি আবার আস্‌ছেন। তার কোন প্রমাণ আমরা পাব কি ?'

'হাঁ, তার একটা ছোট খাট প্রমাণ আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, শোন ; দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বাঁধান সিদ্ধাসনের উপর দিয়ে একটী বড় ডাল পড়ে আছে ; বাংলায় আমার পুনরাবির্ভাব হবার পর সেই ডালটী মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার আসন মুক্ত করে দেবে।'

এই সকল কথাবার্ত্তার পর আরও দুই চারিটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলে আমি অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

প্রত্যুষে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া আমায় ডাকাডাকি করিয়া উঠাইল। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল ; প্রত্যেক কথাটী যেন আমার মস্তিষ্কের অণুপরমাণুতে জাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল। সন্ন্যাসীঠাকুর আমার অসাবধানতার জন্য আমায় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন ; বলিলেন, 'তোমার কি একটুও হুঁস নেই ? এই বর্ষার দিনে এ রকম খোলা যায়গায় সমস্ত রাত কাটালে ? তোমার কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে ? এইরূপ দুই চারি কথা বলিতে বলিতে তিনি আরও বলিলেন, 'কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়ে গেল, তাতে বোধ হয় পড়ে পড়ে ভিজেছ ? আসনও বোধ হয় ভিজে গেছে ?—দেখি ?' বলিয়া সাধু আমার কম্বলে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন ; আমি নীরবে হাতজোড় করিয়া আসন লইয়া কুঠিয়ার গিয়া উপস্থিত হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরমহাশয়ের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বিশ বৎসরের সাধনার কথা ভাবিয়া আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সংসারের মলিনতার মধ্যে এক বৎসর থাকিলে মনের কি শোচনীয় অবস্থাই হয় ! আর সেই সংসারে দশ বৎসর ! তার পর আবার দশ বৎসর সস্ত্রীক সাধনা ! অসম্ভব ! তিনি বুঝিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নিশ্চয়ই তাঁহাকে সম্মোহিত করিয়া বিশ বৎসরের সাধনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। তখন তিনি স্থির করিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথামত যখন পূর্ব্বদিবসেই তাঁহার জীবনের শেষ দিন

গিয়াছে তখন আর চিন্তা কি? নিজেই নিজের দেহপাত করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঝোলার উপর হইতে গঙ্গার খরস্রোতে আত্মবিসর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে সেতুর উপর উঠিলে তাঁহার মনে হইল, 'কেনই বা আত্মহত্যা করিতে আসিয়াছি? আমি বিশ বৎসরের সাধনায় অপারক; আমায় কমিয়ে দাও' এই বলিয়া আমার শেষ প্রার্থনা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে একবার জানাই না কেন?

নির্জ্জন স্থান ভিন্ন কোথায় বসিয়াই বা এ আকুল আবেদন জানান যায়? এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর মহাশয় স্থির করিলেন, গভীর বনের মধ্যে গিয়া তাঁহার এই প্রার্থনা ভগবান শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে জানাইবেন; তাহাতে তিনি দয়া করেন ভালই; নতুবা হিংস্র জন্তুর গ্রাসেই দেহপাত হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুরমহাশয় সন্ধ্যার প্রাক্কালে বনের মধ্যে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র তাঁহার প্রাণে কি এক অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল বনের প্রত্যেক বৃক্ষটী যেন প্রেতের ন্যায় বীভৎস আকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সে বিভীষিকা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ছুটিতে ছুটিতে একেবারে বনের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। পরদিনও সন্ধ্যাকালে ঐরূপ বনে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইলে তৃতীয় দিবসে তিনি প্রত্যূষেই বনে প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে একেবারে দুর্গম স্থানে গিয়া পড়িলেন। ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে নিশাগমে ভয় পাইলেও যেন তিনি আর পলাইয়া আসিতে না পারেন।

সারাদিন নিবিড় বনের সেই দুর্গম পথ অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে ঠাকুরমহাশয় এক বিল্ববৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন। বৃক্ষকাণ্ডের সহিত নিজদেহ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া একান্ত মনে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে

তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে আসিল ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। প্রকৃতির সেই প্রলয়ঙ্করী লীলার মধ্যেই ঠাকুরমহাশয় অচঞ্চল চিত্তে কখনও কথায় কখনও গানে কখনও নীরব অশ্রুবর্ষণে দেবতার চরণে নিজ আবেদন জানাইলেন। ক্রমে সেই দুর্যোগের রাত্রি প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব উঠিলেন; পুনরায় অস্ত গেলেন। আবার রাত্রি; আবার প্রভাত। এইরূপে দুই দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত হইলেও তিনি কিছুমাত্র চঞ্চল হইলেন না; ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ ক্রমেই অসাড় অবশ হইয়া আসিতেছে; তথাপি মনের আনন্দে তন্ময় হইয়াই আছেন; কারণ মৃত্যু হইলেই যে সব দুঃখের শেষ হইবে; আরাধ্য দেবতার কোলেই স্থান পাইবেন।

কণ্ঠাগতপ্রাণ এইরূপ অবস্থায় তৃতীয় রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে ঠাকুর মহাশয়ের মনে হইল যেন পিছনে কাহার পদশব্দ শুনা যাইতেছে; উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে পাইলেন, **'অন্নদা, আর তোমায় বিশ বৎসর সাধনা করতে হবে না। দু বৎসরেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হবে। তুমি যাও; এক বৎসর গৃহে পিতৃমাতৃসেবা আর এক বৎসর সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে সেই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করগে। তাতেই তোমার বিশ বৎসরের সাধনা সিদ্ধ হবে; তার পর বার বৎসরের মধ্যে তোমার মন্দিরের কাজ আরম্ভ হবে।'**

এইরূপে তাঁহার আশা পূর্ণ হইলে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় সেই নিবিড় বন হইতে পুনরায় আশ্রম উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই ভীষণ অরণ্যেও পথ পাইতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই; বনমধ্যে একস্থানে চারিজন ঋষিতুল্য অতি প্রাচীন সাধু দর্শন করিয়া তাঁহাদেরই একজনের সাহায্যে তিনি পথ জানিতে পারিয়াছিলেন। যতিবরের

নিকট হইতে দেশের ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ঠাকুর মহাশয় অনেক কিছু জানিয়াছিলেন। 'স্বপ্নজীবন' গ্রন্থে সে সমস্ত বিশদভাবে বর্ণিত আছে! সে যাহা হউক এই কয়দিনের শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়নের পর তিনি কুঠিয়ায় উপস্থিত হইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। লছমনঝোলায় ভগবানের আদেশ পাইবার পর ঠাকুর মহাশয় যে কয়দিন সেখানে ছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকটি চমৎকার ঘটনার বিবরণ তাঁহার 'স্বপ্নজীবন' হইতে পাঠককে উপহার দিব। তিনি লিখিয়াছেন—

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমি স্বর্গাশ্রমে পরম আনন্দে বাস করিতেছি: মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি ঠাকুর যেদিন বাংলায় যাইতে আদেশ করিবেন সেই দিনই যাত্রা করিব। কেহ হয় ত মনে করিবেন, আবার নূতন করিয়া ঠাকুরের মুখে দেশে ফিরিবার আদেশ পাইবার জন্য আমার এত আগ্রহ কেন? ইহার কারণ এই যে প্রথমতঃ আমার শরীর বড় দুর্ব্বল; স্বর্গাশ্রম ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। দ্বিতীয়তঃ আমি তখন নিঃস্ব; সাধু সাজিয়া রেল কোম্পানিকে রম্ভা প্রদর্শন করিতে মোটেই রাজী ছিলাম না। তাহা ছাড়া তখন আমার সাধ্য কি যে আমি স্বর্গাশ্রম ছাড়িয়া আসি? আমাকে লইয়া যে সেখানে আরও অভিনয়ের অনেক আয়োজন ঠাকুর করিয়াছিলেন। আমার যে সেখানে দেখিবার শিখিবার আরও অনেক বাকী ছিল। কাজেই নূতন করিয়া একটা আদেশ পাইবার মতিগতি আমার হইবারই কথা। আপনারা অভিনিবেশ সহকারে ঘটনাগুলি অনুধাবন করুন; দেখিতে পাইবেন, মানুষের জীবনে কত ঘটে; ভক্তের সঙ্গে ভগবান কতভাবে কত লীলা করেন।

কয়দিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। আজ দ্বাদশী; কাল একাদশীর অল্পাহারের পর আজ ডাল রুটি মিষ্টান্ন প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত আহার্য্য লইয়া গঙ্গাতীরে একটী শিলাখণ্ডের উপর আসিয়া বসিয়াছি। সত্র হইতে আহার্য্য লইয়া আমি প্রায়ই এইস্থানে বসিয়া আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক কুঠিয়ায় ফিরিতাম। যথারীতি খাদ্যদ্রব্যগুলি সম্মুখে লইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইব এমন সময় দেখি দুটী পাহাড়িয়া বালক বালিকা একটী নূতন মাটির কলস লইয়া কিছু দূরে গঙ্গায় জল লইতে আসিয়াছে। আমি চক্ষু মুদিয়া ৺আদ্যামাকে 'মা, খাও' বলিয়া আহার্য্য নিবেদন করিতে করিতে ধ্যানে সেই পাহাড়িয়া বালিকাকেই দেখিতে পাইলাম। মনে বড়ই ধিক্কার আসিল। বালিকাটীর বয়স প্রায় চৌদ্দ পনর; দেখিতে তেমন সুশ্রী

না হইলেও হাবভাব বড় মধুর; ভাবিলাম, আজ আবার মা এ কোন মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন। যাহাই হউক 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' এই মহাবাক্য মনে মনে উচ্চারণ করিয়া সেই মূর্ত্তিকেই আহার্য্য নিবেদন করিয়া দিলাম। তাহার পর রুটি লইয়া একটী বার মাত্র মুখে দিয়াছি, আর মৃদু হাস্যময়ী সেই পাহাড়িয়া মা আমার বিনীতভাবে নিকটে আসিয়া বলিল, 'হাম্‌কোভি বহুৎ ভুখ্ লাগা; কুছ খানে দিজিয়ে।'

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাইত! মেয়েটী কে? উহাকে দেখিয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বনপ্রবেশের পথে সেই যে এক পাহাড়িয়া যুবতীর অস্বাভাবিক আকর্ষণে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলাম, এ মেয়েটী যেন ঠিক তাহারই মত; তবে তাহাকে যেন আরও প্রাপ্তযৌবনা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি মেয়েটীর দিকে তাকাইয়া থাকিলে হাসিমুখে বিনীতভাবে সে আবার আমায় বলিল, 'দিজিয়ে সাধুজী, হাম্‌কো বড়ি ভুখ্ লাগা।'

বালিকার করুণ দৃষ্টি ও কাতর অনুনয়ে আমি আত্মহারা হইলাম। 'ক্ষুধা ত্বং সর্ব্ব ভূতানাম।' কোনরূপ সদসৎ বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বভূতে বিরাজমানা ক্ষুধাদেবীর তৃপ্তিকল্পে রুটী দিবার জন্য যেমন আমি হাত বাড়াইয়াছি, অমনই দূর হইতে 'ঝুঠা মৎ দিজিয়ে; ঝুঠা মৎ দিজিয়ে' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বালক নিকটস্থ হইয়া কুপিত দৃষ্টি সহকারে বলিল, 'তুম ঝুঠা খানে কো আয়া?'

বালিকা আহতভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'কেয়া সাধুজী? ঈ ঝুঠা হায়?'

আহা! মেয়েটী হাত পাতিয়া ক্ষুধার আহার লইতেছে; আর এমন সময় এই বিড়ম্বনা? হায়! হায়! বেচারা হয় ত ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। পরণে জীর্ণ বসন, মাথায় আলুথালু কেশ, ঘর্ম্মাক্তদেহ মেয়েটীকে দেখিলে মনে হয় যেন সে কত কাঁদিয়াছে, যেন তাহার মুখে চোখে তখনও অশ্রুচিহ্ন রহিয়াছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় স্নেহ, বড় দয়া হইল। আমি উত্তর করিলাম, 'কোন বোল্‌তা ঝুঠা?'

অমনই বালক বলিল, 'আলবৎ ঝুঠা; হাম দেখা, আপ খায়া।'

আমি বলিলাম, 'খায়া ত কেয়া হুয়া? খানে মে নেহি ঝুঠা বন্‌তা, ঈ সব মায়িকা প্রসাদী হায়; প্রসাদী কভি ঝুঠা নেহি হোতা।—তুম খা লেও মায়ি।'—বলিয়া একখানি রুটি মেয়েটার হাতে দিলাম। একজনের আহারের মত তিনখানি মাত্র রুটী আমার কাছে ছিল। সানন্দে হাসিতে হাসিতে বালিকা রুটী লইল; রুটির উপর ডাল ও মিষ্টান্ন দিলাম। তখন বালকও বলিল, 'তব হাম্‌কো ভি দেও।'

ছেলেটিকেও 'একখানি রুটি ডাল ও মিষ্টান্ন দিয়া আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। 'আচ্ছা, আভি তুম খা লেও সাধু বাবা', বলিয়া উহারা উভয়ে আমার পিছন দিকে গঙ্গাতীরে বসিয়া রুটি খাইতে লাগিল। আমিও হৃষ্টমনে অবশিষ্ট অংশ ভোজনান্তে জলপান করিয়া পশ্চাৎ চাহিয়া দেখি উহারা আর কেহ নাই। বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে উহাদের সন্ধান করিতে করিতে দেখিলাম, যে কলসটী লইয়া উহারা জল লইতে আসিয়াছিল সেটী অদূরে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন মনে হইল, তবে বোধ হয় উহারা চলিয়া যায় নাই; হয় ত কোথাও গিয়াছে, এখনই আবার আসিবে। এই মনে করিয়া প্রায় এক ঘণ্টার উপর সেই কলসের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম; কিন্তু কই? কেহ ত আসিল না? আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলাম; তাইত! ইহাও কি সত্য ঘটনা নয়? ইহাও কি স্বপ্ন? না মহামায়ার মায়া? ইতিমধ্যে দুই তিন জন সাধু সেখানে আসিলেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তাঁহারা বলিলেন, 'হাঁ, এখানে পাহাড়িরা জল নিতে আসে বটে; তবে ও রকম বয়সের দুটী বালকবালিকাকে ত কখনও আস্‌তে দেখিনি। তা আপনি এক কাজ করুন না? কলসীটী ত দেখ্‌ছি একেবারে নতুন; একদিনও ব্যবহার হয় নি। আপনার যদি জলের কলসী না থাকে ত ঐ কলসী করে এক কলসী জল নিয়ে যান; তারপর যদি এসে খোঁজ করে তখন দিয়ে দেবেন। আপনাকে ত ওরা দেখে গেছে?'

সাধুদিগের পরামর্শমত আমি এক কলস জল লইয়া কুঠিয়ায় গেলাম। কলস রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—সত্যই ত আমার জলের কলস নাই! তাই কি আজ এই কাণ্ড ঘটিল? আরও কত কি যে মনে হইল, তাহা আর কি বলিব? ক্ষণে ক্ষণে সেই বালিকার হাসিমাখা মুখখানি, তাহার সেই করুণ দৃষ্টি ও কাতর অনুনয় আমার মনে পড়িতে লাগিল। বনপ্রবেশকালীন ঘটনার সেই বনচারিনীর সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিয়াও তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, এই দুঃখে হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া যাইতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া বৈকালে ভাগবত কথা শুনিবার জন্য গঙ্গাতীরের সেই দ্বিতল গৃহে গিয়া বসিলাম; সেদিন প্রহ্লাদচরিত্র সম্বন্ধে কথা ছিল। একজন প্রৌঢ় পণ্ডিত কথকতা করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের মধুর চরিত্র সকলকে শুনাইলেন। শুদ্ধ অন্তঃকরণে সেই মধুর কাহিনী শুনিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের অনতিদূরে এক শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিলাম।

শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া অতীত জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিতে করিতে

বৃন্দাবনের পথে কুয়ার ধারে সেই দর্শনের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল সেই ভুবনমোহন রূপ, সেই অপূর্ব্ব হাসি, সেই অমিয় বাণী, সেই স্নেহকরুণ দৃষ্টি, সেই জলতোলা—জল খাওয়া, যমুনাতীরের সেই প্রেম সঙ্গীত, সেই দর্শনের পর দর্শন, একে একে প্রাণবল্লভের অসংখ্য করুণার নিদর্শনের কথাই মনে পড়িল; কিন্তু কই? প্রাণনাথের সেই মনোমোহন বংশীবদন মূর্ত্তি ত কখনও দেখা হয় নাই? বৃন্দাবনধন আমার যে বাঁশীর সুরে সকলকে পাগল করিয়াছিলেন, কই? আমার বংশীধারী সেই বাঁশী করে ত কখনও আমায় দেখা দেন নাই? হাঁ—হাঁ—ঠিক বটে; তাই আমি চিনিতে পারি নাই। তাই বারে বারে আমায় ভুলাইতে পারিয়াছেন; বাঁশী দেখিলে নিশ্চয়ই আমি চিনিয়া ফেলিতাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে স্বপ্নে জাগরণে যে অবস্থায়ই হউক, বাঁশীর সুর যদি কাণে পৌঁছিত, তাহা হইলে আর অমন ফাঁকি দিতে পারিতেন না। এইরূপ অনুশোচনা করিতে করিতে ক্রন্দনের আকুল আবেগে হৃদয় মথিত করিয়া গভীর প্রার্থনা চলিতে লাগিল। তখন আমি যেন আর আমাতেই নাই; আমি যেন আর এ ধরার এ মায়ারাজ্যের জীব নই। তখন আমার আত্মপর জ্ঞান নাই, স্বর্গ মর্ত্ত্যে ভেদ নাই, জীব শিবে পার্থক্য নাই, দেব ও মানবে দূরত্বের ব্যবধান নাই, ভয় ভাবনা কিছুই নাই; আছে শুধু অন্তর বাহির স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্বত্রে ব্যাপিয়া এক আনন্দ ঘন শ্যাম মূর্ত্তি বিরাজমান। আর আমি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপীকে ক্ষুদ্র আমারই মত নররূপ ধরিয়া বংশী করে আমারই সম্মুখে আবির্ভূত হইবার জন্য আরাধনা করিতেছি; আমার হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি, আমার প্রাণের প্রাণ, প্রিয় দেবতা জ্ঞানে ভাল বাসিতে চাহিতেছি; যেন তিনি আমার কতই আপন, কত আত্মীয়। এইরূপ ভাবে নিমগ্ন অবস্থায় মাথার উপর দিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। তাহাতেও আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রেমানন্দে ডুবিয়া আমি আপন মনে গান ধরিলাম—

আহা! সেরূপ একবার দেখাও হরি!
যেরূপে গোকুলে ছিলে গোলকবিহারী!
নবজলধর রূপ শিরে শিখিপাখা—
পিঠে শোভে পীত ধড়া হাসি প্রেমমাখা;
মোহন তিলক ভালে ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারী!
রাধা বলে আধ স্বরে বাজাতে বাঁশরী;
রুণু ঝুণু বাজে পায়ে সোনার নূপুর;
চলিতে চঞ্চল গতি কিবা সুমধুর!

দেখাও দেখাও হরি—
আহা! সেরূপ আমায় দেখাও হরি!
যেরূপ দেখায়ে ওহে! বঙ্কিম নয়ন
হরে নিলে গোপবধূ-লাজ-কুল-মান।
শ্রীদাম সুদাম আদি সখা সঙ্গে লয়ে,
যেরূপে বেড়াতে বনে ধেনু চরাইয়ে।
দেখাও দেখাও হরি—
আহা! সেরূপ আমায় দেখাও হরি!

গান শেষ হইল। কিন্তু কই? প্রাণের জ্বালা ত নিভিল না? অভাব ত মিটিল না? বুক ভাঙ্গিয়া যেন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল; হৃদয়ে যেন তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল; কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গেলে শান্তি পাই, এইরূপ একটা দারুণ অস্থিরতা আমার অন্তর অধিকার করিয়া বসিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার নিজেকে নিজে উন্মাদ, অজ্ঞ, মূর্খ বোধে হেয়জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তথাপি শুধু মনে হইতে লাগিল, ভগবান কেন আমায় দেখা দিবেন না? বংশী হস্তে কেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন না? ভক্তের বাসনা তিনি কেন পূর্ণ করিবেন না? আবার মনে হইল, সে ভাগ্য কি আমার আছে? জানি না, কোন ভাগ্যবলে ভক্ত ভগবানের সেই মোহন মূর্ত্তি দর্শন করে; সেই মনমাতান প্রাণগলান পাগলকরা সুর শুনিতে পায়; সেই প্রেমরস আস্বাদন করিয়া পবিত্র হয়, ধন্য হয়, পরম শান্তির অধিকারী হয়। এইরূপ কত কি ভাবনা ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখি—

আহা! এমন সুন্দর কে ঐ বালক! এমন রূপের আলোয় পার্ব্বত্য নদীতট আলোকিত করিয়া আসিতেছে কে ঐ বালক! বেশ ভূষা দেখিলে যেন মনে হয় একটী বার তের বৎসরের পাঞ্জাবী বালক; কিন্তু এত রূপ এত মাধুর্য্য ইতিপূর্ব্বে কোন বালকে দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। মাথার লম্বা চুলগুলি মোহনচূড়ারূপে বাঁধা; তপ্তকাঞ্চন বর্ণ; সুঠাম সুন্দর অনাবৃত দেহে এক গোছা শুভ্র পৈতা বুকের উপর শোভা পাইতেছে; পরণে মালকোঁচা দেওয়া কাপড়, চরণে তাম্র পাদুকা, মৃণাল ভুজে একটী বাঁশী। বালকের দেহে যেন রূপ ধরে না। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। সে যখন আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আমার যেন কেমন একটা ধারণা হইয়া গেল যে ছেলেটী নিকটেই বোধ হয় কোন কুঠিয়ার

থাকে ; পাঞ্জাবীর ছেলে গঙ্গাতীরে বাঁশী বাজাইয়া গান করিয়া বেড়ায়। ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা কে বুঝিবে? কে বুঝিবে এই ভ্রম কেন হয়? ইহার তাৎপর্য্যই বা কি? আমার আরও মনে হইল, যেন ঐরূপ পাঞ্জাবীর ছেলে আরও কত দেখিয়াছি ; কিন্তু এ ছেলেটী বড়ই সুন্দর, বড় সুদর্শন, বড় প্রেমিক! আহা! কি সুন্দর সেই মুখখানি! সেই আকর্ণবিস্তারী যুগ্ম ভুরু, বঙ্কিম নয়নের সেই মধুর দৃষ্টি, সে যেন এক সৃষ্টিছাড়া রূপের খনি! সেই উন্নত নাসা ; বিম্বাধরে সেই হাসির খেলা ; আহা! সে যে অতুলন ; তাহার যে আর তুলনা নাই! এমন উজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি, এমন মুনিমনোহারী রূপ ত আর কখনও কোথাও দেখি নাই!

স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টিতে বালক যখন আমার মুখের পানে চাহিল, আমার মনে হইল একবার উঠিয়া আলিঙ্গন করি ; কিন্তু পারিলাম না। হৃদয়ের সাধ হৃদয়েই লয় পাইল। আমি শুধু বলিলাম, 'জেরা বাজায়কে শুনাইয়ে না?'

বালক বাঁশী বাজাইতে লাগিল। আহা! কি মধুর! কি মনোহর সে সুর! কি স্বর্গীয় আনন্দ, কি অফুরন্ত তৃপ্তি যে সে সুরে নিহিত ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেই অপার্থিব সুরের অনির্ব্বচনীয় ভাবে আমায় উদাস করিয়া তুলিল। সে সুর থামিলে আমি বালককে পুনরায় বাজাইতে অনুরোধ করিলাম ; কিন্তু বালক শুনিল না। স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে সে বলিল, 'নেহি ; হামারা বহুৎ কাম হায় ; আউর বাজানেকো বকৎ নেহি।' এই বলিয়া বালক প্রস্থান করিল।

বালক চলিয়া গেল। আমার পশ্চাতে গঙ্গার ঘাটে সন্ন্যাসীরা গঙ্গা আরতি করিতে আসিয়াছে, এমন সময় দূর হইতে আবার যেন সেই সুর আমার কাণে আসিল। মনে হইল, একি! এ আবার কে বাজায়?—এ ত সেই বটে! এই বলিল সময় নাই ; আবার ওদিকে গঙ্গার তীরে গিয়া বাজাইতেছে?—আচ্ছা, দাঁড়াও ; শুধু আমার কাছেই তোমার বাজাইবার সময় হয় না?—দেখি কেমন সময় না হয়। এই ভাবিয়া সেই সুর লক্ষ্য করিয়া আমি ছুটিলাম। সন্ন্যাসীরা আরতি করিতেছিল ; সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ; আমি তাহাদিগের পশ্চাৎ দিয়া ছুটিয়া চলিলাম ; বাঁশী তখনও বাজিতেছে ; আমি ছুটিতে ছুটিতে গঙ্গার চড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলাম ; আর খানিকটা গেলেই বালককে ধরিয়া ফেলিব, এমন সময় বাঁশীর সুর থামিয়া গেল ; বালক আমায় দেখিয়া দক্ষিণমুখে ছুটিতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে অনেকটা দূর অতিক্রম করিয়া বালক আবার বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল। আমিও দ্রুত ছুটিয়াছি ; এবার নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিব। আর কিছু করিতে

পারি বা না পারি বালককে একবার বুকে টানিয়া লইয়া বুকের জ্বালা ত মিটাইতে পারিব ? কিন্তু বালক কি দুষ্ট !—আবার ছুটিল—আবার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল। আমি অবিরাম ছুটিতে ছুটিতে এক একবার কাছে আসি, প্রায় ধরিয়া ফেলি আর কি—আর একটু গেলেই হয়, এমন সময় সে আবার দৌড়াইতে থাকে ; আমিও পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকি। এইরূপে একবার দাঁড়ায়, আবার বাজায়, আবার ছুটিয়া পালায় ; এইরূপ কয়েকবার বালকের সহিত ছুটাছুটি হওয়ার পর একখণ্ড প্রস্তরে আঘাত লাগিয়া আমি পড়িয়া গেলাম। আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তখন কোথায় আমি আর কোথায় বা সেই বাঁশীর সুর। দেখি, আমি গঙ্গার ঘাট হইতে বহুদূর চলিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; তখন রীতিমত অন্ধকার রাত্রি।

হায়! একি হইল! এ কি দেখিলাম! ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা আমার মনে পড়িতে লাগিল। চোখের জলে তখন প্রস্তরগাত্র সিক্ত করিয়া আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মযাতনায় আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। নিরাশ হৃদয়ে সেই গভীর রাত্রে অতি সন্তর্পণে কুঠিয়া অভিমুখে চলিলাম। কুঠিয়ায় উপস্থিত হইয়া শ্রান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করিলাম। এ কি অভিনয়! এ কোন রঙ্গ! এ কাহার লীলা তাহাই চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পরমা সুন্দরী এক যুবতী আসিয়া আমাকে বলিল, 'আমায় একটু জল দাও'।

আমি অবিলম্বে সেই নূতন কলস হইতে জল ঢালিয়া তাহাকে দিলাম। জল লইয়া সে বলিল, 'বাঃ বেশ ঠাণ্ডা জল ত' ?

আমি বলিলাম, 'এখানকার গঙ্গাজল আবার গরম কখন' ?

তখন জলপান করিতে করিতে যুবতী বলিল, 'এই কলসীর গুণে ঠাণ্ডা হয়েছে বল্লে কি দোষ হয়' ?

আমি বলিলাম, 'একটি পাহাড়ি মেয়ে এই কলসীটি সকালে ফেলে গিয়েছিল ; আমি এনে রেখেছি'।

যুবতী বলিল, 'তুমি আমাকে খেতে দিয়েছিলে, তাই তার বদলে কলসীটি আমি তোমায় দিয়ে গেছি'।

আমি তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'মিথ্যা কথা বল্‌তে আপনার একটুও সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে না' ?

দেখিতে দেখিতে সেই রূপের পরিবর্ত্তন হইল ; আমি দেখিলাম আমার সম্মুখে সেই পাহাড়িয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমি বালিকার পানে চাহিয়া রহিলাম। বালিকা বলিল, 'আমিই কিনা, দেখ্‌লে ত? এখন চিন্তে পেরেছ, আমি কে?—আমিই তোমার আত্মা'।

বালিকার কথায় সসম্ভ্রমে আমি তাহাকে প্রণিপাত করিলাম ; আর সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। এমন সময়ে কে আসিয়া আমায় স্পর্শ করিল। আমি চকিতভাবে চাহিয়া দেখি, সেই বংশীধারী পাঞ্জাবী বালক! তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। আহা! সে কি স্নিগ্ধ মধুর সুখস্পর্শ! কি অপূর্ব্ব আনন্দ আস্বাদন! সে আলিঙ্গনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমি বলিলাম, 'আঃ—আমার প্রাণ জুড়াল। এতক্ষণ পরে তুমি আমায় আলিঙ্গন দিলে? আমার যে কত কষ্ট হচ্ছিল, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিলে না' ?

বালক হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কষ্ট না হলে কি কেষ্ট মেলে' ?

'এঁ্যা! তুমিই কৃষ্ণ!—তুমিই আমার সেই তৃষাহারী ব্রজবিহারী, তাপিতচিত্ত শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ!—তুমিই আমার সেই!—' বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া আমি পড়িয়া গেলাম ; আর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সব লীলা সব খেলা ফুরাইল। চকিতের মত আসিয়া প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের দেবতা আমার সব খেদ সব সাধ মিটাইয়া চকিতে অন্তর্হিত হইলেন। আমার বিবেক বৈরাগ্য সাধ্য সাধনা সমস্তই যেন কোথায় মিশাইল ; আর তাহার সন্ধান পাইলাম না। কেবল দেখিলাম শুধু প্রাণভরা একটা তৃপ্তি রহিয়া রহিয়া যেন ধ্বনিত হইতেছে—

'পরিপূর্ণ জীবনের সাধ ; পরিপূর্ণ সকল কামনা'।



রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

ভগবান রামকৃষ্ণদেবের অর্পিত কর্ম্মভার শিরোধার্য্য করিয়া তদীয় আদেশ অনুসারেই শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি সাধনায় ব্রতী হইবার পূর্ব্বে ৫।৬ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। তৎপরে জন্মভূমি চট্টগ্রামে গমনপূর্ব্বক তিনি আদিষ্ট সাধনায় ব্রতী হইয়া পিতৃমাতৃসেবায় বৎসর কাটাইলেন; বৎসরান্তে পিতামাতার আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি সস্ত্রীক গঙ্গাতীর দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পূর্ণ এক বৎসর কাল কঠোর ব্রত আচরণপূর্ব্বক তিনি আদিষ্ট মন্ত্রের পুরশ্চরণ সমাধা করেন। সাধনার শেষ হইলে ঠাকুরমহাশয়ের এই সিদ্ধি উপলক্ষে বাংলা ১৩২৭ সালের পৌষ সংক্রান্তির দিন ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশমত নামকীর্ত্তন ও প্রসাদবিতরণাদি মহোৎসবের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি ব্রত উদ্‌যাপন করেন। তদবধি প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় আদ্যাপীঠে সিদ্ধোৎসব নামে বাৎসরিক মহা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সেই প্রথম সিদ্ধোৎসবের দিন ঠাকুরমহাশয়ের সাধনগৃহের সন্নিহিত এক ভূমিখণ্ডে মণ্ডপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাধনগৃহ হইতে সেই ৺আদ্যামায়ের প্রতিমূর্ত্তি উৎসব স্থলে নীত হয়। উৎসব হইয়া গেলে সেইখানেই ক্রমে ৺মায়ের জন্য ৬×৮ হাত একখানি ঘর নির্ম্মিত হয়। দক্ষিণ বারাশত নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহার ব্যয়ভার সমস্তই বহন করিয়াছিলেন এবং ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ ৺মায়ের ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবেই ঠাকুরমহাশয় আদ্যাপীঠের প্রথম পত্তন করেন।

ঠাকুরমহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে প্রথম সিদ্ধোৎসবের পূর্ব্ব

হইতেই উত্তরপাড়ার সুপণ্ডিত জমিদার ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। উভয়ের মিলনে উভয়েই নিজেকে নিজে ধন্য জ্ঞান করিতেন এবং কিসে ঠাকুরমহাশয়ের ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়া ভগবানের আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় সেই চেষ্টায় প্রথমে ৺রাসবিহারী বাবুই ঠাকুরমহাশয়কে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ডাক্তার শচীনবাবু প্রমুখ তরুণের দল ৺রাসবিহারী বাবুর পূর্ব্বেই ৺ঠাকুর মহাশয়ের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহারা ত ৺ঠাকুরমহাশয়ের প্রতি কার্য্যেই যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করিতেন; এমন কি শচীনবাবু ও ৺ঠাকুরমহাশয় তখন একরূপ অভেদ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শচীন বাবু, নির্ম্মল বাবু প্রভৃতি বন্ধুগণের চেষ্টায়ই তখন বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়া দক্ষিণেশ্বরে ৺ঠাকুরমহাশয়ের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এ সকল সত্ত্বেও একজন সহায়সম্পত্তিসম্পন্ন এবং মান্য গণ্য সুপণ্ডিত প্রবীন সমাজপতি হিসাবে স্বর্গীয় রাসবিহারী বাবু যে আন্তরিকতা এবং ভক্তি বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত ৺ঠাকুরমহাশয়ের সাহায্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকেই সেকালে ৺ঠাকুরমহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া সকলে জানিয়াছিল।

প্রথম অবস্থায় ৺ঠাকুরমহাশয়ের নিকট যে সকল ভক্ত যাতায়াত করিতেন প্রথম সিদ্ধোৎসবের পর তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া ৺রাসবিহারী বাবু একটী সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় স্থির হয় যে, 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' নামে একটী সঙ্ঘ গঠিত হউক এবং ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদেশ কার্য্যে পরিণত করাই উক্ত সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হউক। তদবধি ৺রাসবিহারী বাবুর জীবদ্দশায় প্রতিমাসে একটী করিয়া সভা আহূত হইত এবং সেই সভায় সঙ্ঘের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হইত। এইভাবে ৺রাসবিহারী বাবুকে উপলক্ষ্য করিয়াই স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয় **'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা করেন।**

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

জনসমাজে এই দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম দান স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয়ের সেই 'রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা' গ্রন্থও ৺রাসবিহারী বাবুই প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই 'রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা' গ্রন্থের রচনা এক রহস্যময় ব্যাপার। পুস্তকখানি ছোট ছোট কবিতায় গ্রথিত। শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় যখন ভগবানের আদেশ অনুযায়ী সস্ত্রীক পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার সাধনার সেই প্রথম বৎসরে অর্থাৎ বাংলা ১৩২৬ সালে কবিতাগুলি গ্রথিত হয়। পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে ৺রাসবিহারী বাবু যে অবতরণিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আছে—

এই গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতাগুলির লিপিকর (রচয়িতা নহেন) একজন উচ্চকোটির সাধক এবং ভক্ত। ইনি বঙ্গদেশে ধর্ম্মের অচিরভাবী পুনরুত্থানরূপ মহাব্রতের অন্যতম নায়ক। কি অবস্থায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া এই কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিত হইল।

মনঃশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া সাধারণের গোচর হইয়াছিল। কোনও সময়ে ঘটনাক্রমে তাহা জানিতে পারিয়া সাধক মহাশয় তাহা পাঠ করিবার বলবতী ইচ্ছা পোষণ করেন। এক রাত্রি তাঁহার ইষ্টদেব ভগবান রামকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলেন "আমিই তোমাকে মনঃশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দিব।" ইতিমধ্যে সাধক মহাশয়ের পিতা তাঁহার নিকট হইতে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন; সেই রাত্রিতেই ভগবান স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া ভক্তি বিষয়ে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী লিখিয়া লইতে আদেশ করেন। সাধক তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উপকরণাদি গ্রহণপূর্ব্বক লিখিতে বসিলেন; ভক্তিবিষয়ক কবিতাটী তাঁহার লেখনী হইতে অনর্গল বাহির হইয়া গেল। অবশিষ্ট উপদেশপূর্ণ কবিতাগুলি কখনও প্রতিদিন, কখনও বা মধ্যে মধ্যে উক্ত রীত্যনুসারে রচিত হইতে লাগিল। একশত পঁয়ত্রিশটী কবিতা বা উপদেশ কেবল পয়ার

দিনের মধ্যে উপরি উক্তভাবে রচিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট উনত্রিশটী রচনার সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। তবে "ভালবাসা স্বরগের স্ফুট প্রেমালোক" নামক উপদেশটী ঘুমন্ত অবস্থাতেই লিখিত হইয়াছিল, ইহা লিপিকর আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে বিবেচ্য কবিতাগুলির যথার্থ প্রণেতা কে? এরূপ স্থলে কোনও কোনও অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ বলেন লিপিকর স্বয়ংই রচয়িতা। মনুষ্যের ভিতর দুই প্রকার চৈতন্য আছে। একটী বাহ্যচৈতন্য; যদ্দারা মানব বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করে; অপরটী অন্তশ্চৈতন্য। বাহ্য চৈতন্যের ইংরাজী সংজ্ঞা Supraliminal self; অন্তশ্চৈতন্য বা অধস্তন চৈতন্যের নাম Subliminal বা Secondary consciousness বা Unconscious cerebration * মনস্তত্ত্ববিৎ বলেন, মানব চৈতন্য যে দুইভাগে বিভক্ত তন্মধ্যে একটী প্রান্তভূমি বা চৌকাট (limen) আছে; উহার উপরিভাগে বেদনা বা চিন্তা উঠিলে তাহা মনুষ্যের সাধারণ বুদ্ধিগোচর হয় না। নিম্নতলস্থ বেদনাগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহা সাধারণতঃ জ্ঞানগম্য নহে। প্রগাঢ় ধারণা ধ্যান ইত্যাদির দ্বারা অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অনুভব বলে ঐগুলি আমাদের গোচর হয়। সাধকের লিখিত কবিতাগুলির এইভাবে উপলব্ধি হইয়াছিল, কেহ কেহ এই মতের পোষক। আবার কোনও খ্যাতনামা প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ (A. R. Wallace) বলেন মানুষের উপর সিদ্ধপুরুষ, নির্ম্মাণকায়, দেবতা প্রভৃতির "ভর" (Overshadow) ভগবান সর্ব্বজ্ঞ শাক্যমুনি হইতে সাধারণ সাধক পর্য্যন্ত সকলের উপরেই হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান কবিতাগুলি উক্ত দুই উপায়ের কোন উপায়ে লব্ধ। যদি স্বপ্নাবস্থাতেই কবিতাগুলি সাধক কর্ত্তৃক রচিত হইত, এবং জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার স্মরণমাত্র না থাকিত, অথবা "আমি কি কবিতা লিখিয়াছি" ইত্যাকার স্মরণাভাসমাত্র থাকিত, তাহা হইলে উহা অধস্তন চৈতন্যের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু লেখক ইষ্টদেবের উপদেশ পাইবামাত্র, বৈজ্ঞানিকভাবে বলিতে গেলে, ইষ্টদেব তাঁহার মস্তিষ্কে অথবা চৈতন্যে কবিতাটী প্রবেশ করাইয়া দিবার পরক্ষণেই জাগরিত হইয়া তিনি বিনা চিন্তায় বিনা আয়াসে তাহা লিখিয়া ফেলিলেন। অতএব কবিতাগুলি ভগবান রামকৃষ্ণদেবের বুদ্ধি প্রসূত, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। গত

* Edward Von Hartmann' "Philosophy of the Unconscious;" Dr. C. J. Jung's "Psychology of the Unconscious" translated by Dr. Beatrice M. Hinkale.

জীবনে ভগবান বঙ্গদেশের উদ্ধারকল্পে পাতনামা মাত্র করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার নির্ম্মাণ-কায় অদ্যাপি অনেক শুভকর সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিতেছেন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনা গিয়াছে। জগৎ অচিরকাল মধ্যে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিবে।"

কবিতাগুলির যথাযথ আলোচনা করিতে গেলে একখানি গ্রন্থ রচনা হইয়া যায় ; আলোচ্য পুস্তিকায় সেরূপ বিশদ আলোচনার স্থান নাই। সে কারণ কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া পুস্তকের প্রথম ও শেষ কবিতা দুইটী নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম ;—

১।

কি আমীর কি ফকির কি হিন্দু যবন।
যে লভে ঈশ্বরপ্রেম সেই মহাজন॥

২।

সার কথা

সাধন ভজন কর বা না কর
বাসনা ভীষণ ভুলিয়া যাও।
দানে মতি গতি হোক বা না হোক
আসক্তি নিগড় কাটিয়া দাও॥
বলি না ছাড়িতে সংসার স্বজন
যেন না ছলিতে রিপুরা পারে।
থাক ভোগসুখে সতত মগন
পাপ বোঝা যেন মাথে না পড়ে॥
আচার বিচার রাখ বা না রাখ
সাত্ত্বিক আহার করিও ভাই।

জাত কুল শীল গণ বা না গণ
সতের সংসর্গ সতত চাই ॥
বিদ্যা বুদ্ধি যত থাক বা না থাক
বিবেকের পথে চলিতে হবে।
কর বা না কর সংসারের কাজ
পিতৃমাতৃসেবা স্বহস্তে নেবে ॥
মান বা না মান পরম পুরুষ
পর উপকার করিবে সদা।
বুঝ বা না বুঝ পাপ পুণ্য দুই
অন্তর সতত রাখিবে সাদা ॥
জান বা না জান ইহ পরকাল
সকাল সকাল প্রস্তুত হও।
মরণ সময়ে মায়া অভিনয়ে
মনে রেখো তুমি কাহারও নও ॥

এইরূপ সারগর্ভ প্রায় দেড়শতাধিক কবিতায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ আলোচনায় কর্ম্মী, ভক্ত, জ্ঞানী, গৃহী বা সন্ন্যাসী নরনারী প্রত্যেকেই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যলাভের দিকে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকৃত পথ পাইবেন। শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনকে গীতা শুনাইয়াছিলেন, এক কথায় বলিতে গেলে এই মনঃশিক্ষায় তদ্রূপ ভগবান রামকৃষ্ণদেব সময়োপযোগী ভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কলিহত জীবের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৺রাসবিহারীবাবু এই কবিতা রত্নগুলি প্রচারের জন্য প্রবীন সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সেন-

মহাশয় তখন কবিতাগুলি প্রকাশ করিবার কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর মহাশয়ের অলৌকিক কাহিনী আমার স্মৃতিমন্দিরে রাখিয়া দিয়াছিলাম—উপেক্ষাভরে নয়; অন্য কারণে। এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রখর আলোকে সেগুলিকে আমি বাহির করিতে চাহি নাই; এই পাথুরে প্রমাণের যুগে যুক্তি তর্কের কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য সেগুলিকে উপস্থিত করিতে চাহি নাই। কিন্তু দেখিলাম সত্য কখনও লুকাইয়া থাকিতে পারে না; ক্রমে ঠাকুরমহাশয়ের সেই অমূল্য কবিতারত্নগুলি 'রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা' নাম লইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের স্বপ্নাদেশের কথাও সাধারণে প্রচারিত হইয়া গেল। তাহার পর কত স্থানে কত অবস্থায় ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। ইত্যাদি ইত্যাদি—"

যাহা হউক ক্রমে ৺রাসবিহারী বাবুরই চেষ্টায় এবং রামকৃষ্ণগতপ্রাণ প্রবীন ভক্ত ৺যোগেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়ের প্রাণপাত পরিশ্রমেই 'রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা' বাংলা ১৩২৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে মনঃশিক্ষার মুদ্রণ শেষ হইতে না হইতে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্ম্মজীবনে পদার্পণ করিতে না করিতে ৺রাসবিহারী বাবু পরলোক গমন করিলেন। এই ঘটনায় কেহ কেহ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু পরে পশ্চাতে বিপদের বড় বিপদ হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া আজ সঙ্ঘের কর্ম্মীসকল বুঝিতেছেন যে এই বিপদ আপদের মধ্য দিয়াও ভগবান জানাইতেছেন যে এই সঙ্ঘ ঐশী শক্তির দ্বারাই পরিচালিত। বিপদ আপদ ও ব্যক্তিগত বা সমিতিগত বিরোধ ইহাকে ধ্বংস করিতে গিয়া ইহারই ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছে।

আশ্রমের ইতিহাস

ঠাকুর মহাশয়ের সাধনার পর প্রথম বৎসরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা, রাসবিহারী বাবুর দেহত্যাগ ও রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৺রাসবিহারী বাবুর পরলোকগমনে ঠাকুরমহাশয়ের তদানীন্তন প্রধান কর্ম্মী শচীন বাবু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়কে সঙ্ঘের সভাপতিত্বে এবং রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা মহাশয়কে সঙ্ঘের সম্পাদকপদে অভিষিক্ত করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক কার্য্যকরী সমিতি গঠিত করেন। এদিকে যে সকল ভক্ত ও বন্ধুবান্ধব ঠাকুরমহাশয়ের নিকট যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ লাহিড়ী, বাকসাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, কোন্নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মিত্র নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত সত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় ও মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিভূষণ দত্ত প্রভৃতি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীরামপুরের লাহিড়ী ভ্রাতৃদ্বয় একখানি বাসা ভাড়া লইয়া একরূপ স্থায়ীভাবেই দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ক্রমে হরিভূষণ ভায়াও বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরবাসী হইয়া পড়িলেন। শেষে প্রায় বৎসরেক কাল এইরূপ স্থায়ী অস্থায়ীভাবে বন্ধু বান্ধব সাধু সজ্জন দক্ষিণেশ্বরের বাসায় অবস্থানপূর্ব্বক ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গলাভে জীবন ধন্য করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ঠাকুরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক ত্যাগী কর্ম্মী ও ভক্ত সমাগম হইতে থাকিলে ঠাকুরের ব্রত উদযাপনের পর দ্বিতীয় বৎসর অর্থাৎ ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে আদ্যাপীঠের সংলগ্ন গৃহাদিসহ ভূখণ্ড পাঁচ বৎসরের মত জমা লইয়া শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়

আদ্যাপীঠে কর্ম্মীনিবাস স্থাপন ও ক্রমে পিপাসু ভক্তদিগকে ঠাকুরের কর্ম্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন।

আশ্রমে তখন দিবারাত্রি ভগবৎ প্রসঙ্গ; ভাব ভক্তির প্রবল প্রবাহ ও ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ সমাধি। দিবারাত্রি কোঁথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে কাহারও হিসাব নাই। ভক্তসমাগমে প্রতি রবিবারে যেন উৎসব লাগিয়া যায়। খরচ পত্রও আপনা হইতেই জুটিয়া যায়। কলিকাতার বন্ধুবান্ধব ঠাকুর মহাশয়ের জন্য যাহা কিছু প্রতি মাসে সংগ্রহ করিতেন এই সমস্ত উৎসবাদির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিত না। রবিবারের ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন। চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রণবেশ্বর রায় এই সময় কিছুদিনের জন্য আশ্রমের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া নানাভাবে আশ্রমের সাহায্য করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘের সেই শৈশবেই দেখিতে দেখিতে আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বামাচারী শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় রক্তবস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক গৈরিকধারণ করিয়া ঠাকুরের ভাব গ্রহণ করিলেন। ক্রমে দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইলে তৃতীয় সিদ্ধোৎসবের সময় বাকসাড়ানিবাসী নন্দবাবু ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। উৎসবের পরদিন সোমবারে আফিস যাইবার সময় যতই নিকট হইতে লাগিল ততই যেন তাঁহার উন্মাদনা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাকরিজীবি সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন। নন্দবাবুকে আফিস যাইতে বলা হইলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ঠাকুরঘরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলে নন্দবাবু উত্তরোত্তর আরও অধীর হইয়া পড়েন। অবশেষে ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে গৈরিক ধারণ করাইয়া শান্ত করিলেন। ভাবের প্রাবল্যে বাইশ বৎসরের চাকরী একবারে বিনা কথায় ছাড়িয়া নন্দবাবু আশ্রমবাসী হইলেন। পেন্সন পাইয়া দাসত্ব হইতে অবসর লইতে আর তিন বৎসর মাত্র বাকী; সামান্য

দরিদ্র গৃহস্থ হইয়া মোটা মাহিয়ানার এই চাকরী ও তাহার পেন্সনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কি প্রবল আকর্ষণে নন্দবাবু ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা সহজ নয়। ঠাকুরের কৃপায় অবশ্য আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ নন্দবাবুকে পেন্সন হইতে বঞ্চিত করেন নাই ; নির্ভরশীল ভক্তের বোঝা আজ পর্য্যন্ত ভগবান এমন করিয়াই বহিতেছেন। সে যাহা হউক, নন্দবাবুর পর ক্রমে কুমুদ ভায়া, হরিভূষণ ভায়া, রণেন্দ্র ভায়া প্রভৃতি আনন্দ ভাই, জ্ঞান ভাই, শান্তি ভাই, দয়াল ভাই, সত্য ভাই ইত্যাদি ঠাকুরমহাশয়ের দেওয়া নূতন নামে অভিহিত হইয়া আশ্রমের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের শিক্ষামত আত্মাপীঠ জানে এবং প্রচার করে—কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম। যুগধর্ম্ম এই নিষ্কাম কর্ম্মে, ভগবান রামকৃষ্ণের এই আদিষ্ট কর্ম্মে তাই তিনি পিপাসু সাধককে ব্রতী করিতেন। কর্ম্মে দীক্ষা দিতে তিনি কর্ম্মীকে স্বামিজী—মহারাজ নামে সন্ন্যাসীর সম্ভ্রান্ত পরিচয়ে পরিচিত না করিয়া মনুষ্যজীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে ব্রহ্মচারী—ভাই নামে প্রথমাশ্রমীর বিনয়ে অভিষিক্ত করিতেন। আত্মাপীঠের সাধুকে লোকে যেন ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতে পায় ; সাধুও যেন সকলকে ভায়ের মতই দেখে ; এবং পরস্পরের এই ঘনিষ্ঠ ভাব বিনিময়ে সমাজের আদর্শ যেন ব্রহ্মচর্য্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাই এই পরিচয়প্রথার উদ্দেশ্য।

বালিকা আশ্রম

আত্মাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরমহাশয় নিজ জন্মভূমি চট্টগ্রাম হইতে পিতামাতা সহকারে নিজ সংসারের সকলকে গঙ্গাতীরে প্রথমে টিটাগড়ে ও শেষে দক্ষিণেশ্বরেই লইয়া আসেন। গঙ্গাতীরবাসের

বাসনা মিটাইয়া ঠাকুরমহাশয়ের মাতৃদেবী টিটাগড়েই গঙ্গালাভ করেন এবং পরে তাঁহার পিতৃদেব পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে দেহরক্ষা করেন। ঠাকুরমহাশয়ের এই শিবের সংসারে তাঁহার সহধর্ম্মিনী আমাদের মাতাঠাকুরাণীকে আশ্রয় করিয়া কয়েকজন ভক্ত মা ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মায়েদের সঙ্গে দুএকটী বালিকা ছিল। এই সকল বালিকাগুলির শিক্ষার জন্য ঠাকুরমহাশয় উহাদিগকে কোনরূপ আশ্রমাদিতে দিবার ইচ্ছা করিতেছেন এমন সময় ভদ্রকালীনিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল আদ্যাপীঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ক্রমে পাল মহাশয় ঠাকুরমহাশয়ের আদিষ্ট কর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন এবং অবিলম্বেই আদিষ্ট মন্দিরের আনুসঙ্গিক অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে বালিকা দিগকে আর্য্যনারীর আদর্শে শিক্ষাদানের ভার লইতে প্রস্তুত হন। পাল মহাশয় তাঁহার ভদ্রকালীর বসতবাটীতেই বালিকা আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে চাহিলে ঠাকুরমহাশয় নিজ সহধর্ম্মিণীকে আশ্রিতা বালিকাগুলি সহ পাল মহাশয়ের ভদ্রকালীর বাটীতে লইয়া গেলেন। মাতা ঠাকুরাণী কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলে তাঁহার স্থানে দক্ষিণেশ্বর বাসিনী শ্রীযুক্তা শোভাদেবী নাম্নী এক বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলার হস্তে ঠাকুর মহাশয় বালিকাদিগের ভার অর্পণ করেন। এতাবৎ এই বর্ষীয়সী সাধিকার হস্তেই বালিকা আশ্রমের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মচারিণী মা নামে অভিহিত হইয়া ইনি আজ পর্য্যন্ত আশ্রমকর্ত্রীর কঠিন দায়িত্বভার সানন্দে বহন করিতেছেন। বালিকা আশ্রমের প্রথম অবস্থায় আশ্রমোপযোগী নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করিয়া ভদ্রকালীতে এই বালিকা আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন ব্যাপারে সস্ত্রীক পাল মহাশয় সর্ব্বতোভাবে ঠাকুরমহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য ঠাকুর মহাশয়ও পাল মহাশয়ের উপর শাসন সংরক্ষণের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়া তখন তাঁহাকে বালিকা আশ্রমের সম্পাদক করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ঠাকুরমহাশয় এই ব্যবস্থার আমূল

পরিবর্ত্তন করেন। আশ্রম পরিচালন ব্যাপারে নানা বিষয়ে পাল মহাশয়ের সহিত ব্রহ্মচারিণীমার মনান্তর মতান্তর হইতে থাকিলে মেয়ে আশ্রমে পুরুষ সম্পাদক না রাখাই শ্রেয়ঃ বুঝিয়া ক্রমে ঠাকুরমহাশয় সম্পাদক পদ হইতে পাল মহাশয়কে অপসারিত ও তৎপদে ব্রহ্মচারিণীমাকেই নিযুক্ত করেন। ইহাতেও অশান্তির উপশম না হইয়া আশ্রম রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিলে ঠাকুরমহাশয় পালভবনের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বিগত ১৩৩৫ সালে ভদ্রকালী হইতে দক্ষিণেশ্বরে বালিকা আশ্রম উঠাইয়া লইয়া আসেন। বর্ত্তমানে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুরের কোনও অনুষ্ঠান ভদ্রকালীতে নাই।

সঙ্ঘের কার্য্যধারা

কর্ম্মী ব্রহ্মচারীদিগের সাহায্যে আদ্যাপীঠের কার্য্য এবং শচীনবাবু প্রমুখ প্রচারকদিগের প্রচারাদি সহায়ে ঠাকুরমহাশয়ের ভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে এরূপ লোকসমাগম হইতে লাগিল যে আশ্রমের আয় বৃদ্ধির জন্য কর্ম্মীসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভূত হইল। কর্ম্মীসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তখন কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতায় এক ছাত্রাবাস খুলিলেন। মঠের ব্রহ্মচারীরাই তখন শচীনবাবুর সহকারীরূপে আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহকার্য্য করিতেন। পরে ক্রমে ছাত্রাবাসের কার্য্য আরম্ভ হইলে ছাত্রদিগের দ্বারাও আশ্রমের জন্য কিছু কিছু সাহায্য সংগ্রহ হইত। এই ছাত্রাবাসকে শচীনবাবু ভগবানের আদিষ্ট মন্দিরের আনুসঙ্গিক বালক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেরই পূর্ব্বাভাষ মনে করিতেন। স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয় কিন্তু এই

ছাত্রাবাসের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। ছাত্রাবাসের পোষকতা না করিলেও ঠাকুরমহাশয় এ বিষয়ে শচীনবাবুর আগ্রহ দেখিয়া কর্ম্মীর উৎসাহ বজায় রাখিবার জন্য এসম্বন্ধে তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। কর্ম্মীর উৎসাহ বজায় রাখিবার জন্য, কর্ম্মীর শান্তির জন্য ঠাকুর মহাশয় ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্মের অঙ্গ না হওয়া সত্ত্বেও এরূপ আরও দুইটী অনুষ্ঠান শচীন বাবুর অনুরোধেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নাম লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে দিয়াছিলেন ; একটী আংশিক দাতব্য ঔষধালয় ও অপরটী এক পাঠাগার। কুমার সুরেন্দ্র নাথ লাহা মহাশয়ের অর্থ সাহায্যেই অনুষ্ঠানদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। চিকিৎসালয় হইতে সাধারণেরও উপকার এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ী শচীনবাবুরও সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন হইত। সাংসারিক কর্ত্তব্য না করিয়া শচীনবাবুর নিস্তার ছিল না। তদ্ভিন্ন রোগের উপশম, আর্ত্তের সেবা, দীন দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্য প্রভৃতি কার্য্য ব্যাপকভাবে করিবার একটা প্রবল বাসনা শচীনবাবুর অন্তরে আবাল্য নিহিত ছিল। সেগুলির সার্থকতা সম্পাদনের উপায় না হইলে আবার শচীনবাবুর কর্ম্মক্ষয় হয় না। এই সকল কারণে শচীনবাবুর অনুরোধেই ঠাকুরমহাশয় ঐ সকল অনুষ্ঠানগুলি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কার্য্য হিসাবে স্বীকার করিতেন।

লোকে বলে কর্ম্মীর অভাব। মঠ মিশন, সঙ্ঘ সমিতি, কংগ্রেস কমিটী বা রাষ্ট্র রাজ্য খুঁজিলেও কর্ম্মীর অভাব মিটে না। প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব সর্ব্বত্র ; নিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্ম্মী এক আধটী লইয়াই দেখিতে পাই এক একটী অনুষ্ঠান বাঁচিয়া রহিয়াছে। কর্ম্মী হওয়া কি সহজ কথা? জন্ম জন্মান্তর পরার্থপরতা সাধনে পরহিতব্রত যখন সংস্কারে পরিণত হয় তখনই প্রকৃত ত্যাগী কর্ম্মী হওয়া যায়। কর্ম্মী হওয়াই যখন এত কঠিন ব্যাপার তখন কর্ম্মী গড়িয়া তোলা যে কি অসম্ভব কার্য্য তাহা অনুমান করুন। কিছুমাত্র যাহার কর্ম্মশক্তি আছে সেই নিজের খেয়াল মত আজ এটা কাল সেটা পরদিন আর একটা তথাকাথত সৎকাজের সৃষ্টি করিবে।

অহং মমত্বই হইবে তাহার প্রধান সহায়। কর্ম্মজালে সে জড়িত হইবে তথাপি কোন আদেশের আমলে সে আসিতে চাহিবে না; কোন আদেশ সে শুনিতে চাহিবে না। এরূপ কর্ম্মীর দ্বারা সঙ্ঘের কর্ম্ম চলে কিরূপে? সঙ্ঘের কর্ম্মে লাগিতে হইলে অহং চূর্ণ করিয়া কর্ম্মে ব্রতী হইতে হইবে। ঠাকুরের আদিষ্ট কর্ম্ম করিবার জন্য তাই এখানে ঠাকুর মহাশয় স্বহস্তে এই কর্ম্মী সংগঠন কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

কর্ম্মী চালনা কি সহজ কথা? প্রতি কর্ম্মে সদাই প্রস্তুত, নিজে কর্ম্মী হইয়া কি ভীষণ উদ্বেগ কি অসীম সহিষ্ণুতা কি অপার প্রেম ভালবাসা কি অনন্ত দয়া ও ক্ষমার আধার হইয়া যে তিনি আমাদিগকে কর্ম্মের পথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষদর্শী না হইলে, সদ্‌গুরুসংযোগ না ঘটিলে কে বুঝিবে? কর্ম্মীর জন্য কর্ত্তাকে অনেক কিছু সহিতে হয়। কর্ম্মী শচীনবাবুকে তাই ঠাকুরমহাশয় এত স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। কর্ম্মের রহস্য যে কি জটীল, কর্ম্মীর গতি যে কি বিচিত্র তাহা এই আস্থাপীঠের কার্য্যধারা অনুসরণ করিলেই কতকটা অনুমান হইবে।

কলিকাতায় ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রধান কর্ম্মী শচীনবাবুর নেতৃত্বে জনসাধারণের নিকট হইতে সাহায্য সংগ্রহ করিয়া আশ্রমাদি পরিচালন ও সভা সমিতি পুঁথি পত্রাদি দ্বারা যথাসাধ্য ঠাকুরের আদেশ প্রচার কিছুদিন বেশ চলিল। পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন বেদশাস্ত্রী মহাশয় এই সময় সঙ্ঘের প্রচারকার্য্যে সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বেদশাস্ত্রী মহাশয় ও ব্রহ্মচারী জ্ঞানভাই প্রমুখ আস্থাপীঠের ব্রহ্মচারী কর্ম্মিগণ সর্ব্বতোভাবে শচীনবাবুর সাহায্য করিতে লাগিলেন। আস্থাপীঠ ও কলিকাতার ছাত্রাবাস প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির খরচ চালাইবার ভার শচীন বাবু প্রভৃতির হস্তে রহিল এবং ভদ্রকালী বালিকা আশ্রমের খরচ চালাইবার ভার পাল মহাশয়ের উপরই ছিল। ঠাকুরমহাশয় স্বয়ং উভয় তরফেই তত্ত্বাবধান ও প্রধান পরিচালক হিসাবে আশ্রম পরিচালন করিতেন। বলা

বাহুল্য যে সাধারণ নিয়মানুযায়ী সভাপতি পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় ও সম্পাদক কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় প্রভৃতিকে লইয়া যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত ছিল তাহাও মধ্যে মধ্যে লাহা মহাশয়ের বাটীতে সভা করিয়া সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিত এবং বৎসর বৎসর জনসাধারণের নিকট বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী ও বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাবপত্র দাখিল করিত। ঠাকুরমহাশয় এই সকল সভায় কখনও উপস্থিত থাকিতেন কখনও থাকিতেন না। শচীনবাবু তাঁহাকে সমিতির সভ্যশ্রেণীর ঊর্দ্ধেই রাখিয়াছিলেন। এদিকে বলিকা আশ্রমের সম্পাদক পাল মহাশয় কিন্তু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শাখা সমিতি হিসাবে বালিকা আশ্রম Sub-Committeeতে ঠাকুরমহাশয়কে আশ্রমের সভাপতিপদে নাম দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

তখনকার দিনে কর্ম্ম পরিচালন করিতে, কর্ম্মীদিগের উৎসাহ উদ্যম শান্তি শৃঙ্খলা সহযোগ সহানুভূতি বজায় রাখিতে কি অসীম ত্যাগ তিতিক্ষা প্রেম প্রীতি বা অলৌকিক শক্তির পরিচয় যে আমরা ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা সম্যক বর্ণনা করা যায় না। একটী সামান্য ঘটনার বর্ণনা হইতেই এবিষয় কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।—

ঠাকুরমহাশয় কিছুদিনের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। বালিকা আশ্রমের আর খরচ চলে না। আশ্রমসম্পাদক পাল মহাশয়ের ব্যবসায়ের আয় নাই। সঙ্ঘের নামে ভিক্ষা করিয়াও কর্ম্মিগণ কুলাইতে পারে না। পাল মহাশয় ধরিয়া বসিলেন সঙ্ঘের কলিকাতার তহবিল হইতে শচীন বাবুর দল মাসিক সাহায্য না দিলে বালিকা আশ্রম কংগ্রেসের অধীন করিয়া দিবেন; তাঁহার বিশ্বাস রাজনীতিকদিগের সংস্রব থাকিলে সহজে অর্থাগম হইবে। এই ধারণায় হয় ত বা ঠাকুরমহাশয়কে না জানাইয়াই পাল মহাশয় উক্ত মর্ম্মে কলিকাতার কমিটিতে এক আবেদন পেশ করিয়া বসিলেন। এদিকে

কলিকাতার তহবিলের অবস্থাও বরাবরই "অস্থ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ"। কর্ত্তৃপক্ষ পাল মহাশয়কে সঙ্ঘের প্রতিনিধিস্বরূপ অর্থ সংগ্রহ করিবার অধিকার দিয়াই খালাস ; নিজ তহবিল হইতে অর্থসাহায্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। কাজেই পাল মহাশয়ের তাগাদার তাড়নায় তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তাহার উপর হয় ত দেশের বিভিন্ন নারী অনুষ্ঠানের কুৎসা কাহিনী কর্ণগোচর হওয়ায় সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ মেয়ে আশ্রমের ঝঞ্ঝাট না রাখাই ভাল মনে করিয়া পাল মহাশয়কে কবুল জবাব দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। কার্য্যকরী সমিতির কার্য্য যথাবিধি এতদূর অগ্রসর হইলে ঠাকুরমহাশয়ের ভক্ত অতি কষ্টে ঠাকুরমহাশয় ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জঞ্জাল রীতিমত জমিয়া উঠিলেও ঠাকুরমহাশয় ফিরিয়া আসিতেই সমস্ত সমস্যা অরুণোদয়ে প্রভাতশিশিরের মত অদৃশ্য হইল। ঠাকুর হয় ত বালিকা আশ্রমের সাহায্য সংগ্রহের জন্য একজন কর্ম্মী বাড়াইয়া দিলেন। আশ্রমকে রাজনীতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইতেও হইল না ; কলিকাতার তহবিল হইতে পালমহাশয়ের দাবীও মিটাইতে হইল না ; কর্ম্মী ও কর্ম্ম দুই রক্ষা পাইল।

স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের নেতৃত্বে ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশবাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এই শৈশবেই নানা ভাবে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামির ভাব না থাকায় রাজসরকারের অনুরোধে আলিপুর কারাগৃহের বন্দীসংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থস্থানের পবিত্রতা রক্ষার জনপ্রিয় আন্দোলন সেই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান পর্য্যন্ত এই সঙ্ঘের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে। স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয় স্বয়ং এই সকল কার্য্যে উৎসাহী হইয়াছিলেন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে যোগদান উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারী হেমন্ত ভাই সঙ্ঘের তরফ হইতে ট্রেনে ভিক্ষা সংগ্রহে নিযুক্ত হন ; পরে

সত্যাগ্রহ আন্দোলন শেষ হইলে তিনি ঐ ট্রেনেই বালিকা আশ্রমের প্রচার ও সাহায্য সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অদ্যাবধি পরম নিষ্ঠার সহিত উক্ত আশ্রমের সেবাদ্বারা স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের এই মাতৃপূজায় প্রাণপাত করিতেছেন। তারকেশ্বরের কার্য্যশেষে দুইজন সত্যাগ্রহী ঠাকুরের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া সঙ্ঘের কার্য্যে যোগদান করেন। ইঁহারাই পরে ব্রহ্মচারী পঞ্চানন ভাই ও ব্রহ্মচারী মণিভাই নামে অভিহিত হইয়াছেন। উভয়েই এক্ষণে সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও এই মণিভাই ভক্তি বিশ্বাসের গুণে অদম্য উৎসাহে সর্ব্বসাধারণের নিকট ঠাকুরের আদেশ প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন। সঙ্ঘের ছাত্রাবাসের দুইজন ছাত্রও অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পরাবিদ্যালাভের আশায় ১৩৩৩ সালে স্বগায় ঠাকুরমহাশয়ের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। ব্রহ্মচারী সুধীর ভাই ও ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন ভাই নামে আদ্যাপীঠের কর্ম্মীসঙ্ঘে ইঁহারা সুপরিচিত। সতীর্থ এই ব্রহ্মচারীদ্বয়ের সঙ্গলাভ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইঁহাদের সত্যানুসরণ, ইঁহাদের শিক্ষা সংযম ত্যাগ তিতিক্ষা সত্যই অনুকরণীয়। ইঁহাদের সঙ্গী আর একজন ছাত্রও ঠাকুরের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই নির্দ্দেশমত সঙ্ঘের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইনি ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই। সঙ্ঘের যে কোন কার্য্যে আহ্বানমাত্রে যোগদান করিতে-সদাই প্রস্তুত এই ব্রহ্মচারী নিজগুণে সকলের স্নেহভাজন হইয়াছেন। ছাত্রাবাসের জনৈক ছাত্র ও ভক্ত শ্রীমান সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মারফত ভগবান রামকৃষ্ণের এই অভিনব লীলার সংবাদ পাইয়া ময়মনসিংহ হইতে জনৈক ভক্ত সংসার ত্যাগ করিয়া ১৩৩৪ সালে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণসকাশে উপস্থিত হন। ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে ইনি কিছুকাল লছমনঝোলার স্বর্গাশ্রমে তপস্যা করেন। আদ্যাপীঠের ত্যাগী ভক্তদিগের মধ্যে ইনি যোগেশ্বর ভাই নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এইরূপে নানা দিক হইতে ঠাকুরের ভক্ত কর্ম্মী সকল আসিয়া জুটিতে থাকিলে আস্থাপীঠের কর্ম্মীদল সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকিল। ক্রমে ভগবানের আদেশ প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং ঠাকুরমহাশয় শচীনবাবু, আনন্দভাই, জ্ঞানভাই প্রভৃতি কর্ম্মীদিগকে লইয়া মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিলেন। সে বিগত ১৩৩৩ সালের কথা; বর্দ্ধমানের বিচারবিভাগীয় সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ সে সময়ে ঠাকুরের কার্য্যে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন গুহ ও শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল পদস্থ ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় আদিষ্ট মন্দিরের কার্য্যে বর্দ্ধমান হইতে যে অর্থসাহায্য সংগ্রহ হইয়াছিল তাহারই সহিত কলিকাতায় সংগৃহীত অর্থ একত্র করিয়া সঙ্ঘের তদানীন্তন সম্পাদক কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের নামেই আদিষ্ট মন্দিরের জন্য বাংলা ১৩৩৩ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বর চৌধুরী পাড়ায় বর্ত্তমান আস্থাপীঠের জমি ক্রয় করা হয়। সংগৃহীত অর্থ জমিক্রয় কার্য্যে পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় কিছু ঋণ হইয়াছিল। ঋণ পরিশোধের জন্য লাহা মহাশয় ঐ জমি বন্ধক দিয়াছিলেন। উক্ত বন্ধকী দায় উপলক্ষ্য করিয়া সঙ্ঘের কর্ম্মীবৃন্দের এক ভীষণ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে কথা যথাক্রমে আলোচিত হইবে।

আস্থাপীঠের নিজস্ব জমি খরিদ হইবার পর পুরাতন আশ্রমগৃহের জমার মেয়াদ শেষ হইয়া আসিল। তাহার পূর্ব্বেই স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রী৺মাতাঠাকুরাণী জীবনলীলা সংবরণ করেন। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীশ্রী৺মা দেহরক্ষা করেন এবং আশ্বিন মাসে ঠাকুরমহাশয় বর্ত্তমান আস্থাপীঠে স্থায়ীভাবে আশ্রম উঠাইয়া লইয়া আসেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাতাঠাকুরাণীকে আশ্রয় করিয়া কয়েক জন ভক্ত মা সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর দেহান্তে মাতৃআশ্রমের এই সাধিকা মায়েরা শ্রীশ্রী৺মায়েরই আদর্শে সাধনপথে অগ্রসর হইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই মায়েরা সাধ্যমত ভগবানের আদিষ্ট কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। বালিকা আশ্রমের মেয়েদের শিক্ষাদান ও মাতৃজাতির মধ্যে ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশ প্রচার এই মায়েদের অন্যতম কার্য্য।

নূতন জমি ক্রয়ের অব্যবহিত পরেই চাঁপদানীর ভক্তগণ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত মিলিত হন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ আঢ্য, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন অধিকারী, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল আঢ্য, শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ দাস প্রভৃতি ঠাকুরের কার্য্যে সবিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। নিজে সামান্য ব্যক্তি হইয়াও আদ্যাপীঠের নূতন জমিতে কর্ম্মীদিগের বসবাসের উপযোগী ঘরদুয়ার নির্ম্মাণের জন্য শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র ঘোষ তাঁহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দান করিলেন; উপরন্তু চাঁপদানীর অন্যান্য ভক্তদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া উক্ত শরৎভাই আদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারী দয়ালভাই এর সাহায্যে আশ্রমের নূতন জমিতে কর্ম্মীনিবাস নির্ম্মাণ করেন। সে সময়ে উক্ত শরৎ ভাই ও পঞ্চাননভাই ব্রহ্মচারীদিগের সহিত আদ্যাপীঠে থাকিয়াই মঠের তত্ত্বাবধান করিতেন।

আশ্রমের নূতন জমির পার্শ্বেই বট অশ্বত্থাদি বৃক্ষসমাকীর্ণ ছয়টী জীর্ণ শিবমন্দির ছিল; মন্দিরগুলির কোনটীর চূড়া ভগ্ন, কোনটীর প্রাচীর পতনশীল, কোনটীর বা শীর্ষভেদ করিয়া বিশাল মহীরুহ ভূগর্ভে মূল বিস্তার করিয়াছিল। পতনোন্মুখ মন্দিরগুলির অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ হইলেও ভক্তের কীর্ত্তি ধ্বংস হইতে দেওয়া বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। তাই তিনি আদ্যাপীঠের মত একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এই স্থানে স্থাপিত করিলেন। জীর্ণ মন্দিরগুলির মালিক মন্দির সংস্কার ও দেবসেবার অনুমতি দেওয়ায় ঠাকুরমহাশয় হাওড়া শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অপ্রকাশ



মাতৃ-আশ্রমের সাধিকাগণ

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থসাহায্যে একটী শিবমন্দির সংস্কার করাইয়া ভাড়াটীয়া সেই পুরাতন জমি হইতে আশ্রম উঠাইয়া লইয়া আসেন। অপ্রকাশ বাবুকে এই মন্দির সংস্কার কার্য্যে ব্রতী করাইতে আরিয়াদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ ঘোষাল সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক ক্রমে অন্যান্য মন্দিরগুলির সম্বন্ধে যথাবিহিত করিবার জন্য মালিকদিগের নিকট হইতে পাকা রকমের একটা দলিলপত্র করাইয়া লইতে চাহিলে আশ্রমের প্রতিনিধির নিকট তাঁহারা তখন খরিদ বিক্রয়ের কথা তুলিলেন। কোন মাড়োয়ারী নাকি তখন ঐ জীর্ণ মন্দিরগুলি দুই হাজার টাকায় খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই নৈরাশ্যজনক উক্তি শুনিয়া আদ্যাপীঠের প্রতিনিধি সাধু আনন্দভাই শেষ অনুরোধ করিবার জন্য রাত্রিপ্রভাতে পুনরায় তাঁহাদের দ্বারস্থ হন। দৈবের কি বিচিত্র গতি! সেদিন তাঁহারা আগ্রহসহকারে পূর্ব্ব রাত্রের এক স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া তদ্দিবসেই ঠাকুরমহাশয়ের শ্রীচরণসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

চমৎকৃত হইয়া আনন্দভাই শুনিলেন, ভদ্রলোক সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। নিদ্রার আবেশ হওয়ামাত্র তিনি স্বপ্নে দেখেন, বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া যেন তাঁহাকে দংশন করিতে আসিতেছে; সমস্ত রাত্রি বার বার এইরূপ বিভীষিকা দেখিয়া রাত্রিশেষে তিনি দেখেন, অষ্টম বর্ষীয়া এক কুমারী যেন তাঁহাকে বলিতেছে, "মন্দিরগুলি সব অন্নদাকে ছেড়ে দে; না হলে তোর মঙ্গল নেই।" এই ঘটনার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভদ্রলোক রাত্রিপ্রভাতেই আনন্দভাইকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিতান্ত অনুগতভাবেই ভদ্রলোক ঠাকুরমহাশয়ের পদধূলি লইয়া জীর্ণ মন্দিরগুলি তাঁহাকে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

নামমাত্র মূল্যে ঠাকুরমহাশয় তখন মন্দিরগুলি আদ্যাপীঠের নামে খরিদ করিয়া লইলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি সংস্কারের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল সেগুলি আর না রাখিয়া অন্যান্যগুলি আমূল সংস্কার করাইবার ব্যবস্থা করেন। কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব রাত্রে দেবাদিদেব ঠাকুরমহাশয়কে দর্শন দিয়া আদেশ করেন, "একটী মন্দিরও ভাঙ্গা হবে না; তোমার মায়ের মন্দিরের আগে প্রত্যেকটী শিবমন্দির সংস্কার হওয়া চাই।"

আদেশ অনুযায়ী ঠাকুরমহাশয় ধ্বংসকার্য্যের পরিকল্পনা ছাড়িয়া একটীর পর একটী যাহাতে সংস্কার হয় তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে অচিরে দ্বিতীয় শিবমন্দির সংস্কার হইয়া গেল। কর্ম্মীবর শচীন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী মাতা শশীমুখী বসুজায়ার অর্থসাহায্যে এই সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে কৃতসংস্কার শিবমন্দির দুইটীর মধ্যবর্ত্তী অল্পপরিসর স্থানে আদিষ্ট মন্দিরের আদর্শে ৺মায়ের ঘর নির্ম্মাণও সম্পন্ন হইল। ভক্তপ্রধান ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের স্বর্গীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর স্বর্গকামনায় এই ঘর উৎসর্গীকৃত হইল। ভুপেন বাবুও এতাবৎকাল আদ্যাপীঠের প্রত্যেক উৎসবে ৺মায়ের বিশেষ পূজার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুরমহাশয়ের বর্দ্ধমান যাওয়ার সময় হইতে আদ্যাপীঠের গঠনকার্য্যে কতকগুলি পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ঠাকুরের কার্য্যে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বর্দ্ধমান যাতায়াত উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী৺ সত্যনারায়ণজীউ আদ্যাপীঠে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। সে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

ঠাকুরমহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম সেই বর্দ্ধমান যাতায়াতের সময় এক দিন ভগবান তাঁহাকে নারায়ণমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া বলেন, "আমাকে নিয়ে এসে আদ্যাপীঠে রাখ।" তাহার পর মন্দিরের

কাজে ঠাকুরমহাশয় একবার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রায়ের বাসায় অতিথি হইলে শরৎবাবু তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গনে বেলতলায় রক্ষিত একখানি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁহাকে দেখাইয়া বলেন, "দেখুন দেখি, এখানি কি কোন দেবমূর্ত্তি? আমরা এ বাসায় আস্‌বার আগে থেকে এখানি এখানে আছে।" মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ঠাকুরমহাশয় বলিলেন "এ মূর্ত্তি ত দেখ্‌ছি শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়নজীর; এঁর স্থান ত বেলতলায় নয়। তাই বুঝি সেদিন নারায়ণ আমায় দর্শন দিয়ে আস্তাপীঠে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করেছিলেন?" এই কথায় শরৎবাবু সমস্ত ব্যাপার জানিতে চাহিলে ঠাকুর মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। তখন শরৎবাবুরই খরচায় শ্রীশ্রী৺ সত্যনারায়ণজীকে বর্দ্ধমান হইতে আদ্যাপীঠে আনা হইল; শরৎবাবুরই অর্থসাহায্যে আদ্যাপীঠে ৺সত্যনারায়ণজীর ঘর হইল; এবং তদবধি আজ পর্য্যন্ত শরৎবাবুরই অর্থে আদ্যাপীঠে ৺সত্যনারায়ণজীর সেবা পূজা বিধি মত চলিতেছে।

এই ভাবে বর্ত্তমান আদ্যাপীঠের দুইটী শিবমন্দির সংস্কার, ৺মায়ের ঘর ও ৺সত্যনারায়ণজীর ঘর নির্ম্মাণ এবং আশ্রমের কর্ম্মীনিবাস ও রন্ধনশালা নির্ম্মাণ এবং বেলতলা বাঁধান হইলে ঠাকুরমহাশয় তাঁহার স্বপ্নজীবন গ্রন্থ-রচনায় মনঃসংযোগ করেন। বহুদিন যাবৎ তাঁহার জীবনের অমূল্য ঘটনা-বলী তাঁহার নিজ মুখে একরূপ শুনিয়া পরে আবার লোকমুখে তাহার বিকৃত বিবৃতির বিড়ম্বনা দেখিয়া ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন। তাই ভক্তজীবনে ভগবানের লীলা ও ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশবাণী যথাযথ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি জীবনের যে অংশে স্বপ্নাদেশে পরিচালিত হইয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহারই ঘটনাবলী অবলম্বনে 'স্বপ্নজীবন' রচনা সুরু করিয়াছিলেন। রচনা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার একান্ত অনুগত নিমতানিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত শৈলজাকান্ত রায়চৌধুরী

মহাশয় উহা প্রকাশের জন্য মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করেন। মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইলে ঠাকুরমহাশয় কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। মুদ্রিত অংশও নিতান্ত সামান্য নয় দেখিয়া প্রকাশক মহাশয় উহাই 'স্বপ্নজীবন' প্রথম খণ্ড হিসাবে তখনকার মত প্রকাশ করেন।

আশ্রমের নিজস্ব জমি খরিদের পর উপরি উক্ত কার্য্যাবলী সমস্তই বাঙ্গালা ১৩৩৪ সালে সম্পন্ন হয়। আবার এই ১৩৩৪ সালেই শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল চক্ষুচিকিৎসা উপলক্ষ্যে বালিকা আশ্রমের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ব্রহ্মচারিণী মায়ের উপর বালিকা আশ্রম পরিচালনের ভার পড়ে। এই ব্রহ্মচারিণী মা ও পাল মহাশয়ের মধ্যে যে মনান্তর মতান্তরের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা এই মায়ের সম্পাদিকা পদ প্রাপ্তির পরেই আত্মপ্রকাশ করে। আশ্রম পরিচালনকার্য্যে পাল মহাশয়ের সাহায্য না পাওয়ায় ব্রহ্মচারিণী মা সকল সময়েই ঠাকুরমহাশয়ের শরণাপন্ন হইতেন। কাজেই কর্ম্মের পেষণে চতুর্দ্দিক হইতে পীড়িত হইলেও ঠাকুরমহাশয়কে এই বৎসর বালিকা আশ্রমের জন্যও সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

ঘটনাবহুল এই ১৩৩৪ সালের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেই ঠাকুরমহাশয় সিদ্ধোৎসবের পূর্ব্বদিন কালরোগে আক্রান্ত হন। উৎসব হইয়া গেলে তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। রোগের প্রথম আক্রমণের পর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ঠাকুরমহাশয় আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জটাভার নামাইয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত করা হয় এবং সেই ১৩৩৪ সালের মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে আদ্যাপীঠে বেলতলার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে ঠাকুরমহাশয়ের জটাভার প্রোথিত করিয়া আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঠাকুর মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন সে বৎসর রামনবমী ঝুলনপূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্বদিবসগুলিতে উৎসবাদি অনাড়ম্বরভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের পর ঠাকুর মহাশয়ের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বালিকা আশ্রমের সম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী মা ও আশ্রমগৃহস্বামী পাল মহাশয়ের দ্বন্দ্ব মিটিল না। রোগশয্যাশায়ী অবস্থায় বারংবার অনুরোধ করিয়াও ঠাকুরমহাশয় পাল মহাশয়কে বালিকা আশ্রম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহার রোগ দুরারোগ্য হইয়া উঠিলে চিকিৎসকদিগের পরামর্শে তিনি শ্রীধাম পুরীতে গিয়া সমুদ্র তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঠাকুরমহাশয়ের এই অনুপস্থিতিতে ভদ্রকালী বালিকা আশ্রমে অশান্তি অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অবশেষে আশ্রমবাসিনীদিগের তরফ হইতে ঠাকুরমহাশয়ের নিকট তারযোগে উদ্ধারের আবেদন পুরীধামে পৌঁছিল। পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঠাকুরমহাশয় দেখিলেন কলিকাতার কমিটি আশ্রম-গৃহস্বামী পাল মহাশয়কে আশ্রমের সমস্ত ভার দিয়া অশান্তির সহজ মীমাংসা করিয়াছেন; কিন্তু পাল মহাশয়ের সহিত ব্রহ্মচারিণী মার সদ্ভাব না থাকায় এই ব্যবস্থায় আশ্রমবাসিনীদিগের অশান্তি স্বভাবতঃই বাড়িয়া উঠিল। আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণী মা ও কুমারীমায়েরা অগত্যা ঠাকুর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন।

ঠাকুরমহাশয় কমিটীর ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন না; কারণ যাহাদের জন্য আশ্রম পত্তন তাহাদের শান্তিই ঠাকুরমহাশয়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিতেন, আশ্রম কারাগার নহে। তাঁহার বালিকা আশ্রম পরিচালন ছিল কুমারীপূজার নামান্তর মাত্র; তিনি জানিতেন এই সকল কুমারী মায়েরা আনন্দময়ী মূর্ত্তি; সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী। তাই মাতৃপূজার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতীক কতকগুলি কুমারী লইয়া তাহাদের লালনপালন এবং শিক্ষা ও সেবার ভার তিনি নিজেই লইয়াছিলেন। শক্তিহীন জাতিকে শক্তিপূজায় প্রবর্ত্তিত করিতে, শক্তিসাধক বাঙ্গালীকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিতে তিনি শুধু মূর্ত্তিপূজার আয়োজন করিয়া

ক্ষান্ত হন নাই। আচারে ব্যবহারে, শিক্ষা দীক্ষায়, সেবা ও সাধনায় সর্ব্বতোভাবে তিনি মাতৃজাতির প্রতি ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা সমাদরের আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতৃজাতির সেবক মায়ের সন্তান শ্রীশ্রী৺অন্নদা ঠাকুর তাই তখন মাতৃমূর্ত্তি এই আশ্রমবাসিনীদিগের শান্তির জন্য কমিটির কাহারও কাহারও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে ভদ্রকালী হইতে দক্ষিণেশ্বরে বালিকা আশ্রম উঠাইয়া লইয়া আসেন। সম্পাদক প্রভৃতি সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্মিগণ তখন এই ব্যবস্থার পোষকতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বালিকা আশ্রম দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া রোগের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শমত ঠাকুরমহাশয় পুনরায় পুরীধামে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরমহাশয়ের জীবনের আশা নাই বুঝিয়া তখন কলিকাতার কমিটি সঙ্ঘের অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে ঠাকুরমহাশয়ের ব্যবস্থামত কার্য্য পরিচালিত করা অপেক্ষা বৈষয়িক দৃষ্টি লইয়া ভবিষ্যত সম্বন্ধে সাবধান হওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন। আশ্রমের পূর্ব্বকথিত নূতন জমির ঋণদায়ের উপর পাল মহাশয়ের মূল্যবান আশ্রমগৃহ হারাইবার আশঙ্কা বিষয়ীদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তাঁহারা বিষয়রক্ষার জন্য ঠাকুরমহাশয়ের ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। ফলে ঠাকুরমহাশয়ের ভক্ত শিষ্যবৃন্দ কার্য্যকরী সমিতির অবাধ্য হইয়া উঠিলেন; ব্রহ্মচারিগণ কলিকাতার ছাত্রাবাসাদি পরিত্যাগ করিয়া আদ্যাপীঠে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। সঙ্ঘের প্রথম এবং প্রধান দুর্য্যোগের মেঘ জমিয়া উঠিতে আর বাকি রহিল না।

পুরীধামে শেষ শয্যায় ঠাকুর শুনিলেন কলিকাতার কমিটি দক্ষিণেশ্বর বালিকা আশ্রমকে সঙ্ঘের অনুষ্ঠান নহে বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষণা করিতেছে এবং আদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারীদিগকে শাসনাধীন করিবার জন্য ছাত্রাবাসে সংগৃহীত আশ্রমের প্রাপ্য অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়াছে;



শ্রমবাড়ি গণ

বলিয়া যখন চিকিৎসকগণ ক্রমে আমার জীবনের আশা ত্যাগ করিতেছেন তখন দেখিতেছি কমিটির মধ্যে সঙ্ঘের ভবিষ্যত মঙ্গলে অতিরিক্ত উৎসাহী একটী দল প্রবল হইয়া সঙ্ঘের কর্ম্মে আমার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতে বসিয়াছে। উৎসাহের আতিশয্যে ইহারা আমার অনভিপ্রেত কর্ম্মেও আমার অনুমোদনসূচক ভাষায় আমার নাম লইয়া সংবাদপত্রাদিতে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে। জগজ্জননী উহাদিগকে সুমতি দিন ও সুপথে পরিচালিত করুন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

সঙ্ঘের এইরূপ অবস্থায় আমার নীরব থাকিবার উপায় নাই ; কারণ আদিষ্ট কর্ম্মের দায়ভার সম্পূর্ণ আমার। কাজেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক ও জনসাধারণের নিকট আমার অনুরোধ এই যে তাঁহারা সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যেন সঙ্ঘের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। এই দীন ব্রাহ্মণ সন্তানকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া যে দৈবকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে একজনের পরিদর্শনাভাবে যেন তাহার আদর্শ ক্ষুণ্ণ না হয়। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যিনি একমুষ্টি ভিক্ষাদানেও সাহায্য করিয়াছেন, ৺মায়ের পূজায় যিনি এক কপর্দ্দক ব্যয় করিয়াছেন আমি জানি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণে তিনি রাজা মহারাজার সহিত তুল্য অধিকারী। জনসাধারণের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ব্যয়ে অসমর্থ হইলেও নিয়ত সঙ্ঘের মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে এই সকল ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণকে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে এই

রোগশয্যা হইতে কাতর কণ্ঠে আমি আহ্বান করিতেছি তাঁহারা সমবেত চেষ্টায় এই ধর্ম্মানুষ্ঠানটীকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করুন ; দীন দুঃখী নিরাশ্রয় যাহারা আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া সঙ্ঘের আশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহাদিগকেও অভয় দিয়া উৎসাহিত করুন। জগজ্জননী অবশ্য আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন। ইতি—২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ সাল।

এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্য দিয়াই স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের রোগভোগ বৎসরেক কাল পূর্ণ হইল। ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অনুষ্ঠান বজায় রাখিবার মত আয়োজনে আদ্যাপীঠের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইল। উৎসবে সমবেত পৃষ্ঠপোষকগণ আদ্যাপীঠ হইতে প্রচারিত বিবরণী মারফত বিশৃঙ্খলার ইতিহাস ও ঠাকুরমহাশয়ের মতামত অবগত হইলেন। সকলে জানিল সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি শীঘ্রই পুনর্গঠিত হইবে।

বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের সংবাদ পাইয়া ১৩৩৫ সালের ৩রা মাঘ ঠাকুরমহাশয় শ্রীধাম পুরী স্বর্গদ্বারে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। উত্তেজিত বিরুদ্ধবাদিগণ ঠাকুরমহাশয়ের দেহান্তে নেতৃহীন ব্রহ্মচারীদিগের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। প্রথমে শুনিতে পাওয়া গেল আদ্যাপীঠের জমিক্রয় ব্যাপারে লাহা মহাশয় যে সাড়ে তিন হাজার টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন সেই ঋণ যদি ব্রহ্মচারীবৃন্দ অবিলম্বে পরিশোধ করিতে পারেন তাহা হইলে বিরোধী দল সমস্ত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব স্বীকার করিলেও অর্থসম্বল না থাকায় ব্রহ্মচারিগণ ভিক্ষা করিয়া ক্রমে ঋণ পরিশোধ করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। ইহাতে ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া আশ্রমের জমি ও গৃহাদি দখল করিবার উদ্দেশ্যে

ছলে বলে কৌশলে ব্রহ্মচারীদিগকে আত্মাপীঠ লইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বিরোধী দল রীতিমত প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। প্রচারের অসুবিধাও কিছু ছিল না; অর্থবল লোকবল উভয়ই তাঁহাদের ছিল। তাহার উপর মেয়ে আশ্রম লইয়া বিরোধ হওয়ায় বিপরীত বুদ্ধি নিজ নৈতিক দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিয়া বিরুদ্ধ প্রচারে নিন্দা কুৎসা পর্য্যন্ত করিল; তদ্ভিন্ন ভগবানের আদিষ্ট কার্য্য শেষ না হইতে ঠাকুরমহাশয় দেহত্যাগ করায় তাঁহার অন্যতম প্রধান ভক্ত তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বিরুদ্ধ দলের পোষকতা করিয়াছিলেন। তাহাতেই এই দল হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া আত্মাপীঠের ধ্বংসসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

দেশের সাধারণ লোকে হুজুক পাইলেই মাতিয়া উঠে। তাহাতে আবার শিশু অনুষ্ঠানের অভাব অভিযোগ লইয়া নিয়ত ব্যস্ত আত্মাপীঠের কর্ম্মিগণ স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সহিত মেলামেশা করিবার অবসর পান নাই; ফলে গ্রামবাসী সকলে প্রথমে বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন না। নিন্দুক লোকের উৎসাহে তাই কিছুদিন বিপক্ষ পক্ষের তাণ্ডব বেশ চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। পারিবেই বা কিরূপে? ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকে। অর্থবল লোকবল না থাকিলেও ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্মবল ছিল। গুরুর আদেশ পালনে বদ্ধপরিকর আত্মাপীঠের কর্ম্মীবৃন্দ তাই গুরুবলে প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

প্রবল প্রতিপক্ষ আত্মাপীঠের সকল পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেও গুরুকৃপায় অশিক্ষিত অকর্ম্মণ্য এই কয়জন নগণ্য ব্যক্তি আত্মাপীঠের কার্য্যে যেরূপ দ্রুতগতি সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছেন তাহা লক্ষ্য করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন যে বিধাতার কৃপাদৃষ্টি ইহাদের উপর বর্ষিত হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া গ্রামবাসিগণ আত্মাপীঠের বিপক্ষপক্ষের কার্য্যকারণে ক্রমে তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি

সাধনে যথাসাধ্য ব্রহ্মচারীদিগের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। আস্থাপীঠ এখন গ্রামবাসীদিগের গৌরবের বস্তু; আস্থাপীঠের সকল কার্য্যে তাঁহারা এখন সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, জমিদার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় বি এ এল এল বি, উকিল শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার বি এ বি এল, শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জমিদার শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ প্রভৃতি দক্ষিণেশ্বর আরিয়াদহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ সকলেই এখন ব্রহ্মচারীদিগের সহিত পরিচিত হইয়া আস্থাপীঠের কার্য্যে সবিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

শত্রুশক্তির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ব্রহ্মচারিগণ ঠাকুরমহাশয়ের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ১৩৩৫ সালে শ্রীপঞ্চমীর দিনে আস্থাপীঠে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির পুনর্গঠন করিয়া লইলেন। কলিকাতার পুরাতন কমিটির সহিত আস্থাপীঠ বা শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর প্রবর্ত্তিত ভগবান রামকৃষ্ণের আদিষ্ট কার্য্যের কোন সম্বন্ধ রহিল না। ব্রহ্মচারীদিগের উচ্ছেদসাধনে বৈধ অবৈধ সকল প্রণালীই প্রযুক্ত হইয়াছিল। অবৈধ সকল চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া বৈধ চেষ্টার দিক দিয়াও প্রতিপক্ষ কোন ত্রুটি করে নাই। কার্য্যকরী সমিতির পুনর্গঠন করিয়া ব্রহ্মচারিগণ কলিকাতার কমিটি ছাত্রাবাস পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় সহ বাদ দিয়া দক্ষিণেশ্বর কেন্দ্রেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নামে ভগবানের আদিষ্ট কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে ঠাকুর মহাশয়ের গৃহী ভক্তগণ সকলেই ব্রহ্মচারী কর্ম্মীদিগের সহায় হইয়াছিলেন; আর পুরাতন কমিটির যাঁহারা আস্থাপীঠের ভূসম্পত্তি দখল করিবার চেষ্টায় ব্রহ্মচারী বিতাড়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারাই আইনের সাহায্যে উক্ত ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকার লাভের আশায় কলিকাতার কমিটি বজায়

রাখিয়া নিজেদের নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ রেজেষ্ট্রী করাইয়া লইলেন। আইনের দিক দিয়া ইহা সামান্য নহে ; কারণ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেক্রেটারী হিসাবে কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহার নামে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করা হইয়াছিল। সঙ্ঘ রেজিষ্ট্রী হওয়ায় সম্পত্তির ক্রেতা হিসাবে সম্পত্তির স্বত্ব যেমন থাকিল, সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ হিসাবেও সেইরূপ উক্ত কমিটির অধিকার আইনসঙ্গত হইল। আইনের এই ফাঁকে পড়িয়া ব্রহ্মচারিগণ কোনরূপ বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া তদবধি দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নামে আদ্যাপীঠের কাজ চালাইতে লাগিলেন।

বৈধ চেষ্টার এই প্রথম দফা শেষ হইতে না হইতে দক্ষিণেশ্বরের সরকারী জরিপ আরম্ভ হইলে Settlement Courtএ জমির স্বত্ব ও দখল লইয়া উভয় পক্ষ বিচারপ্রার্থী হন। ইহাই বৈধ চেষ্টার দ্বিতীয় দফা। কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তখন রেজিষ্ট্রীকৃত সঙ্ঘের নামে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে এক নাদাবীপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় রেজিষ্ট্রীকৃত সঙ্ঘ Settlement Courtএ নিজ দাবী পেশ করিলে বিচারক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মচারীদিগের কৈফিয়ৎ শুনিলেন এবং সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি রেজিষ্ট্রীকৃত সঙ্ঘের দাবী খারিজ করিয়া দিলেন। প্রভাত বাবু এই মামলার সংস্রবে আদ্যাপীঠের কার্য্যে ও সাধুদিগের আন্তরিকতায় এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে তদবধি নানা ভাবে এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। প্রতিপক্ষের অর্থবল লোকবল এইভাবে সমস্তই ব্যর্থ হইতে লাগিল। ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ অনেকেই ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মচারীদিগের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে অস্বীকার করিয়াছিল ; তাহাতে ছাত্রাবাস ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। সকল দিকে এইভাবে বিফল হইয়া শেষে প্রতিপক্ষ বৈধ চেষ্টার তৃতীয় দফায় চরম আয়োজন করিয়া বসিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদ্যাপীঠের জমিক্রয় বাবদ ঋণের জন্য লাহা মহাশয় আদ্যাপীঠের জমি

বন্ধক দিয়াছিলেন। এই শেষ চেষ্টায় Alipur Munsiff's Courtএ বন্ধকী দেনা শোধের জন্য মামলা রুজু হইল। ঋণের দায়ে আদ্যাপীঠ নীলামে উঠুক এই অভিপ্রায় কাহারও ছিল কি না জানি না, তবে ঋণ-শোধে ব্রহ্মচারীদিগের আপ্রাণ চেষ্টা ও পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার সত্বেও তাহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিপক্ষ মামলা রুজু করিয়াছিলেন। সত্যই তখন আশ্রমের অর্থসঙ্গতি মোটে ছিল না। আনন্দভাই সুধীরভাই প্রমুখ আদ্যাপীঠের সাধুগণ লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তখন অর্থচিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন; চিন্তায় কূল কিনারা না পাইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন। আদ্যাপীঠের সেই অগ্নিপরীক্ষার দিনে অভয়া আমাদিগকে অভয় দিয়াছিলেন শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়া; এই রাধাচরণ বাবুরই চেষ্টায় নিজ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোন ভক্ত মহাপ্রাণ প্রয়োজনীয় চারি হাজার টাকা দান করিয়া আদ্যাপীঠ নিষ্কণ্টক করিলেন। ধন্য এই দান! আর ধন্য এই প্রাণ!

অবশেষে বিরোধের অবসান হইল। মামলা মিটাইতে আলিপুর আদালতের স্বনামধন্য উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিনা পারিশ্রমিকে আদ্যাপীঠের তরফে আদালতে জবাবদিহি করিয়াছিলেন। রাধাচরণ বাবুর কথায় আশুবাবুকে বলা হইল, টাকা দিব। লোকে একথা বোল আনা বিশ্বাস করিতে পারিল না; মুখের কথা নিজের মনও বিশ্বাস করিতে পারিল না; উৎকণ্ঠায় দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। এমনই দিন তখন গিয়াছে। কিন্তু দেবতার মহিমা কে বুঝিবে? শেষ মুহূর্ত্তে পুরুষকার যখন নিঃশেষে কর্ম্ম শেষ করিয়াছে তখনই তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার আদেশের ও তাঁহার কৃপার সার্থকতা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ঠাকুর মহাশয় বলিতেন 'টাকা ভূতে যোগাবে।' আদ্যাপীঠের ঋণ

মোচন উপলক্ষ্যে দেখা গেল তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যাঁহার সঙ্গে কোন দিন আদ্যাপীঠের কোন সম্বন্ধ ছিল না, স্বর্গীয় অন্নদাঠাকুর মহাশয়কে যিনি চর্ম্মচক্ষে কখনও দেখিয়াছেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না এমন লোক কি না এক কথায় চারি হাজার টাকা লোকচক্ষুর অগোচরে দান করিলেন! কোটিপতি নয় লক্ষপতি নয় সাধারণ পরিচয়ে কোন ধনীও নয়; সাধারণ গৃহস্থের এই দান! চারি লক্ষ টাকা অপব্যয়ে যাহাদের কেশাগ্র কম্পিত হয় না চারি সহস্র টাকা ধর্ম্মার্থে দান করিতে তাহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয়; আবার দেবালয়ের দায় উদ্ধারে সমস্ত সঞ্চয় প্রশান্ত চিত্তে দান করিয়া মানুষ নিঃস্ব সাজে! বিচিত্র ভগবানের সৃষ্টি! কে দেয় আর কে রাখে! কার টাকা আর কে দেয়! এত দেখিয়া শুনিয়াও কি আমাদের শিক্ষা হয় না! দেবতার কর্ম্ম দেবতাই করিতেছেন; মানুষ নিমিত্ত মাত্র। কে আছ ভক্ত ঝাঁপাইয়া পড়; উপলক্ষ্য হইয়া ধন্য হইবে।

দেবতা যে স্বয়ং আদ্যাপীঠ রক্ষা করিতেছেন, দেবতার ইচ্ছায় যে আদ্যাপীঠের জন্য কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এই দারুণ অভাবের এইরূপ আশাতীত পূরণও তাহার অন্যতম প্রমাণ। স্বর্গীয় অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান রামকৃষ্ণের আদিষ্ট কর্ম্ম ব্যাহত না হইয়া দ্বিগুণ শক্তিতে অগ্রসর হইয়াছে। ঠাকুরমহাশয় তাঁহার শেষ সময়ে নিজেই বলিয়াছিলেন **"ওরে এই দেহটাই অন্নদা ঠাকুর নয়; সীমাবদ্ধ দেহটা গেলে তখন অসীম শক্তিতে কাজ হবে; তোরা প্রত্যেকেই তা উপলব্ধি করতে পারবি।"** একথা যে সত্য তাহা আদ্যাপীঠের এই আপদোদ্ধার ইতিহাস পাঠ করিয়া বোধ হয় পাঠকও অনুমান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়; ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশ যে ধীরে ধীরে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহার আর একটী প্রত্যক্ষ

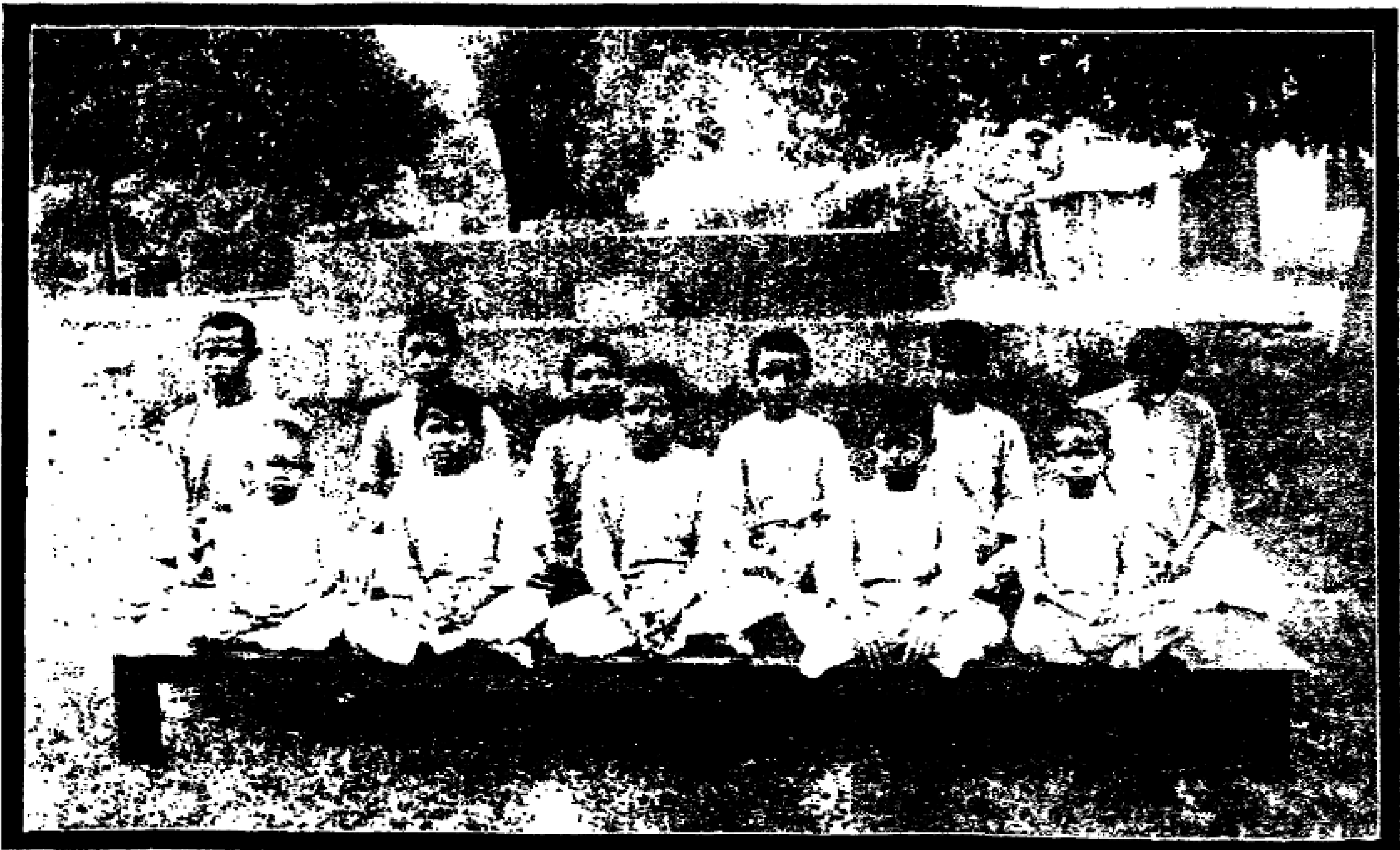
প্রমাণ এই যে ঠাকুরমহাশয়ের দেহান্তের পরও ঠাকুরের ভক্ত কর্ম্মী সব একে একে ঠাকুরের কার্য্যে যোগ দিতেছেন। তাহাদের মধ্যে চারিজন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিও আছেন। আই এ বি এ, পাশ সম্ভ্রান্ত বংশের গৌরব এই সকল সাধু ব্রহ্মচারী আদ্যাপীঠের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করেন। সাধু সতীশ ভাই বঙ্কিম ভাই ও ব্রহ্মচারী যুগল ভাই এই ভাবে ঠাকুরমহাশয়ের পরবর্ত্তী যুগে আদ্যাপীঠের কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি! ধর্ম্মরাজ্যের কি বিচিত্র বিধান! এ রাজ্যে আইন আমলার দাবী দাওয়া নাই, শক্তি সামর্থ্যের প্রাধান্য নাই, বিদ্যা বুদ্ধিরও সার্থকতা নাই যদি মূলে ভক্তি বিশ্বাস না থাকে; ভক্তি বিশ্বাসের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা। ভক্তিবিশ্বাসহীন কর্ম্মবীরও এখানকার কেহ নয়; ভক্তিবিশ্বাসবান অতিথিও এখানে পরমাত্মীয়। তাই আজ দেখি ঠাকুরমহাশয়ের দেহাবসানে ভগবানের কার্য্যে যিনি ভক্তি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, কালে তিনি সঙ্ঘের প্রধান পাণ্ডা থাকিলেও আজ তাঁহার সহিত আদ্যাপীঠের কোন সংস্রব নাই; আবার ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্মে ভক্তিবিশ্বাসবান হইয়া যিনি সঙ্ঘের সুখে দুঃখে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন, নবাগত হইলেও তিনি আদ্যাপীঠের প্রাণ। সাধু সতীশভাই ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত; এই সতীশভাই জীবদেহে ঠাকুরমহাশয়কে দুই একবার দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসের গুণে সেই ক্ষণিকের দর্শনেই তিনি এমন প্রেরণা পাইয়াছিলেন যে ঠাকুরমহাশয়ের দেহরক্ষার কয়েক মাস পরেই তীব্র বৈরাগ্য আশ্রয়ে আদ্যাপীঠে কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। আজ বৎসরাধিক হইল তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অনন্যচিন্তা হইয়া ঠাকুরের ইঙ্গিতমত তিনি আদিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। ঠাকুরের পার্ষদ বা সমসাময়িকদিগের সৌভাগ্য স্মরণ

করিয়া যাঁহারা মনে করেন "এখন ঠাকুর অপ্রকট হইয়াছেন ; এখন আর কেই বা আছে ?" তাঁহাদিগকে আমরা বলি, নিরাশ হইবার কারণ নাই। আদ্যাপীঠে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসীর উদ্ভব বরাবরই সম্ভব। সাধু সতীশ ভাই তাহার প্রমাণ। ঠাকুরমহাশয়ের পরবর্ত্তী যুগেই ইনি আদ্যাপীঠে আসিয়াছেন। তথাপি এই সাধুর ভাব ভক্তি প্রত্যক্ষ করিলে সহজেই অনুমান হয় যে ভগবানের আদিষ্ট মন্দির স্থাপনের পূর্ব্বেই যদি এরূপ সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব আদ্যাপীঠে সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই মন্দির স্থাপন ও তাহাতে ঈশ্বর দর্শনাদি আরম্ভ হইলে অবশ্যই বৎসর বৎসর সেখানে দ্রষ্টার উদ্ভব হইবে। আদ্যাপীঠের কোষ্ঠীতে বিধাতা ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিপদে অধীর হইয়া আমরা সময় সময় চোখে অন্ধকার দেখিলেও একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সম্পদ বিপদের ভাঙ্গা গড়াই আমাদিগকে প্রকৃত পরিণতির পথে পরিচালিত করে। তাই এখন মনে হয় সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের দেহান্ত উপলক্ষ্যে এই বিপ্লবেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বিপ্লবের ফলে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে কলিকাতা ছাত্রাবাসের পরিবর্ত্তে ঠাকুরমহাশয়ের আদর্শ অনুযায়ী আদিষ্ট মন্দিরের আনুষঙ্গিক অন্যতম অনুষ্ঠান বালকদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিগত ১৩৩৭ সালে আদ্যাপীঠে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দীন দুঃখী কয়েকটী বালক আদ্যাপীঠের পোষ্যমধ্যে গণ্য হইতেই বালক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আয়োজনে সঙ্ঘের ব্রহ্মচারী সুধীরভাই উদ্যোগী হন। ব্রহ্মচারী সুধীর ভাইএর পরিশ্রম এবং শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই আশ্রমটী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে দশটী বালক আশ্রমে স্থানলাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বরভাই ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বালকদিগের তত্ত্বাবধানভার লইয়াছেন। আশ্রমের শিক্ষা সংস্কৃতমূলক। পণ্ডিত উমাচরণ স্মৃতিরত্ন ব্যাকরণতীর্থ



আশ্রমবালকগণ



বালক আশ্রম দৃশ্য

মহাশয় আদ্যাপীঠে অবস্থানপূর্ব্বক বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইতিমধ্যেই বালকদিগের মধ্য হইতে কলিকাতা সংস্কৃতসভার পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। সংস্কৃতের সহিত বালকদিগকে ইংরাজীও শিখিতে হয়। ইংরাজি না শিখিলে বহির্জগতের সহিত আদানপ্রদান সম্ভব হইবে না; কাজেই ইংরাজি শিক্ষারও প্রয়োজন; কিন্তু ইংরাজি শিখিয়া আমাদের বালকবালিকারা আত্মবিস্মৃত হইবে না। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া আমরা জড়বাদ ও নাস্তিকতার পোষক হইয়া উঠিয়াছি তাহা বিষবৎ পরিহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ভাব আমাদের শিক্ষার আদর্শে ওতঃপ্রোতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আমি কে, কি জন্য এই সংসারে আসিয়াছি, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, আমার ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মই বা কাহাকে বলে, এই সকল ভাবনা আমাদের প্রত্যেক বিদ্যার্থী ভাবিতে শিখিবে। আর্য্যঋষিদিগের আদর্শে চরিত্রগঠন-মূলক এই জাতীয় শিক্ষা দেওয়াই বালক আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। অতীতের সেই মহা আদর্শ লক্ষ্য করিয়া চরিত্রবান ভগবৎবিশ্বাসী সুস্থ শিক্ষিত এক আত্মনির্ভরশীল জাতি এই দেশে যাহাতে আবার গড়িয়া উঠে সেই চেষ্টায় এই আশ্রম পরিচালিত।

কার্য্যের প্রসারে এখন আমরা দেখিতে পাই স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের দেহান্ত সময়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যে দুর্য্যোগের মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল গর্জ্জন বর্ষণে উহা কাটিয়া গিয়া আবার আশার আলো দেখা দিয়াছে। নবীন উৎসাহে আবার কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আদ্যাপীঠের ঋণ মোচন হয় সেই শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ক্রমে সঙ্ঘের উদ্দেশ্যসাধনে উত্তরোত্তর যত্নবান হইয়া উঠিলে তাঁহাকেই সঙ্ঘের সম্পাদক পদে অভিষিক্ত করা হয়। ইতিপূর্ব্বে কিছুদিন শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনে ব্রহ্মচারীদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্ঘের সম্পাদকপদে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আদ্যাপীঠে তিনটী শিবমন্দিরসংস্কার, বালকাশ্রমগৃহ ও দুইটী কুঠিয়া এবং পায়খানা নির্ম্মিত হইয়াছে। কুঠিয়া দুইটী ঠাকুরমহাশয়ের ভক্ত নিমতানিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলজাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিরক্ষার্থ করাইয়া দিয়াছেন। শিবমন্দির সংস্কারের মধ্যে একটী দক্ষিণেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আর একটী আরিয়াদহনিবাসী শ্রীযুক্ত বাসবচন্দ্র দাস মহাশয় করাইয়া দিয়াছেন। এই কার্য্যও আমরা দেখিলাম স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয়ের কথামতই অনুষ্ঠিত হইল। দাতৃদ্বয় যখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে এই কার্য্য তাঁহারা করিবেন তখন এক সময় ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছিলেন দুইটী শিবমন্দির আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বরের ভক্তদ্বারা করাইতে হইবে। তাঁহার প্রতি কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে। হায়! আজও তাঁহাকে চিনিলাম না!

সঙ্ঘের কার্য্যধারা আলোচনায় এখন আমরা দেখিতে পাই স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের ব্রত উদ্‌যাপন অথবা সিদ্ধিলাভের পর একাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; ইতিমধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি আদ্যাপীঠের মুক্ত জমিতে, সাধু সন্ন্যাসী কর্ম্মী ব্রহ্মচারীর এই সাধনভূমিতে আদিষ্ট মন্দিরের ভিত্তিপত্তন পর্য্যন্ত হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ না হইতে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে সর্ব্বসাধারণ মন্দির স্পর্শ করিতে পাইবে—ইহাই ভগবানের আদেশ। ভগবানের পবিত্র আসন স্পর্শ করিবার অধিকার জীব পাইবে কি না, জীবের সে আগ্রহ আছে কি না কালে তাহা প্রমাণিত হইবে। কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ পূর্ব্বতন কার্য্যকরী সমিতির অধীনে আদ্যাপীঠের কার্য্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহার পরে ঠাকুরমহাশয়ের আদেশে পুনর্গঠিত সমিতির অধীনে এই দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কার্য্য এতাবৎ কিভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল। বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতির কার্য্য

করিতেছেন—সভাপতি শ্রীমৎ আনন্দভাই; সহ সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলজাকান্ত রায়চৌধুরী; সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চট্টোপাধ্যায়; সহ সম্পাদক ব্রহ্মচারী জ্ঞানভাই; সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত করুণাময় বসু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন অধিকারী, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মচারিণী শোভা দেবী, সাধু সতীশ ভাই, সাধু যোগেশ্বর ভাই, ব্রহ্মচারী সুধীর ভাই, ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন ভাই, ব্রহ্মচারী মণি ভাই, ব্রহ্মচারী পঞ্চানন ভাই, ব্রহ্মচারী হেমন্ত ভাই ও ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর ভাই।

সত্যের সন্ধান

যে অনুষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি উহার মূলে ভগবানের আদেশ। স্বপ্নাবস্থায় শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর মহাশয় ভগবান রামকৃষ্ণের যে আদেশ পাইয়াছিলেন তদনুযায়ী এই সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে এই অভিনব প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিবার সময় এই স্বপ্নাদেশ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সত্যের সন্ধান স্বপ্নে পাওয়া যায় কি না তাহার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য বাংলা ১৩৩০ সালে আদ্যাপীঠে এক মহতী সভায় বাংলার বহু মনস্বী ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। আস্তিক নাস্তিক বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সন্দেহবাদী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শ্রোতৃবৃন্দের সংশয় মিটাইয়া যে সকল মনীষি ঐ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের উক্তি নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি এগুলির সাহায্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী পাঠক পাঠিকা কিছু নূতন আলোক পাইবেন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় বলেন,—

"যে ঘটনার জন্য আজ আমরা সকলে এখানে উপস্থিত উহার মূলে স্বপ্ন—স্বপ্নই উহার ভিত্তি। ভগবানের অনুকম্পাবশতঃ আবিষ্ট হৃদয়ে অন্নদাঠাকুর যে আদেশ পাইতেছেন তদনুসারে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। শ্রুতিতেও স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ হেরম্ব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে এবং এক ব্যক্তি তাঁহার উদরে জ্বলন্ত কাষ্ঠ প্রবিষ্ট করাইতেছে। শ্রুতি বলেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শনে মৃত্যু অবধারিত। স্বপ্নভঙ্গে তিনি সকলকে ঘটনাটী বলিলেন এবং সেই দিবসেই অকস্মাৎ দাস্ত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।"

সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—

"ভগবান রামকৃষ্ণদেবের স্বপ্ন সত্য হয়, অন্নদাঠাকুরের স্বপ্ন সত্য হয়, কিন্তু সাধারণের স্বপ্ন সত্য হয় না কেন? কারণ, আকাশের মেঘ হইতে যে জল আসে উহা নির্ম্মল নির্ব্বিকার ও বিশুদ্ধ। তেঁতুল, নিম, ইক্ষু, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ সেই একই জল টানিয়া লইতেছে। কিন্তু আধারভেদে কাহারও ফল তিক্ত কাহারও ফল সুস্বাদু এইরূপ হইতেছে। সেইরূপ যিনি যে পরিমাণে শুদ্ধ সত্ত্বের আধার, সত্য স্বপ্ন সেই পরিমাণে তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

উপনিষদে আছে স্বপ্ন সত্য। স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়া সিদ্ধিলাভ করা যায় ইহা তন্ত্রের কথা। সিদ্ধিলাভ যে করা যায় ইহা যখন সত্য তখন যে স্বপ্নের মধ্য দিয়া মন্ত্র পাওয়া যায় সে স্বপ্ন সত্য না হইবে কেন?"

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে শ্রুতি স্মৃতি বেদ পুরাণে আর আমাদের তেমন আস্থা নাই। সে সব যখন ইউরোপীয়গণ আবৃত্তি করেন তখনই আমাদের ভাল লাগে। সেই জন্য স্বপ্ন সম্বন্ধে একটী ইউরোপীয় ঘটনা অবলম্বনে উক্ত সভার সভাপতিরূপে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিব।—

"পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাঁহারা মনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহারা বলেন যে জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কের সাহায্যে যে জ্ঞান তাহার নাম Brain Consciousness; কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জ্ঞান আছে। এই 'জাগ্রৎ' জগৎ ব্যতীত 'স্বপ্ন' 'সুষুপ্তি' 'তুরীয়' ও 'নির্ব্বাণ' এই চারিটী জগৎ আছে। ইউরোপের বিজ্ঞান জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুইটী ব্যতীত আর কোন জগতের সন্ধান পায় নাই।

সমুদ্রে যখন বরফ ভাসিয়া যায় তখন মনে হয় যে, কেবল জলের উপর প্রায় ৬ হাত বরফ আছে; কিন্তু নিকটে যাইলে দেখা যায় যে জলের মধ্যে প্রায় ৭০ হাত বরফ রহিয়াছে। সেইরূপ জাগ্রৎ চৈতন্য আমাদের সমগ্র চৈতন্যের অংশ মাত্র। স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তাহা ছাড়া ঐ বিষয়ে আরও কত অজ্ঞাত তত্ত্ব রহিয়াছে কে জানে। বোধোদয়ে পড়িয়াছিলাম, "স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে স্বপ্নেও বিজ্ঞান আছে। স্বপ্নে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল ইউরোপীয় অনেক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বপ্নে ৺আত্মামূর্ত্তি প্রাপ্তি অপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা নহে।

আমি সেইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। ঘটনাটী Sir Oliver Lodge, Psychical Journal of America নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন এবং আমেরিকার মনস্তত্বের একজন প্রসিদ্ধ প্রফেসর উহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন প্রফেসর সাইমণ্ড (Prof. Symond) এসেরীয়তে একটী গবেষণামূলক Expeditionএ গমন করেন এবং ভূপ্রোথিত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করিতে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ভগ্নাবশেষের মধ্যে ভূপ্রোথিত একটী (Aster) এস্টার দেবের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। উহার দুই কর্ণে (Aget) এগেট নামক বহুমূল্য রত্নের একটি কুণ্ডল পাওয়া যায়। তাহাতে প্রাচীন অক্ষরে কি লেখা ছিল। সাইমণ্ড সাহেব ঐ লেখা উদ্ধার করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এমন সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এসেরীয়ার একজন প্রাচীন শুভ্রকেশ পুরোহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন "তুমি যে কুণ্ডল পাইয়াছ তাহার আর এক অংশ (Hungary) হাঙ্গেরী রাজ্যের (Budapest) নগরীর যাদুঘরে একটী পেটিকায় রক্ষিত আছে; উহা আনয়ন করিলে ইহার অর্থ অনায়াসে বোধগম্য হইবে। সেই যাদুঘরের অধ্যক্ষের সহিত সাইমণ্ড সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি তারযোগে তাঁহাকে স্বপ্ন বিষয় জ্ঞাত করিলেন এবং কুণ্ডলটী নিউইয়র্ক সহরে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এক মাসের মধ্যে তিনি ডাকযোগে কুণ্ডলটী প্রাপ্ত হইলেন। কুণ্ডলের তিনটী খণ্ড একত্র করায় যে লিপি আবিষ্কৃত হইল তাহার মর্ম্ম এই যে, একজন সম্রাট কোন ব্রত উপলক্ষে তাঁহার ইষ্টদেবকে ঐ কুণ্ডল প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ঐ কুণ্ডলে সম্রাটের নাম লিখিত ছিল। সাইমণ্ড সাহেব তাঁহার কার্য্যবিবরণী লেখা শেষ করিয়া প্রেসে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বপ্নাদেশ সত্য; অন্নদাঠাকুরের এই স্বপ্নাদেশ অলীক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন না। কারণ স্বপ্নাদেশ যে সত্য তাহা ক্রমে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুর উক্ত অধিবেশনে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—

"রাসবিহারী বাবু কৈজারাদে আমাকে আশ্রয় দেন। একদিন তিনি আমার বাসায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রত্যাদেশে বিশ্বাস কর?" আমি বলিলাম করি। তাহার কিছুদিন পরে তিনি একদিন আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একজন সাধু; আর সেই সাধুপ্রবরের হাতে একখানি হাতে

লেখা পুঁথি। রাসবিহারী বাবু বলিলেন "এঁর নাম অন্নদাঠাকুর আর এই যে খাতাখানি দেখ্‌ছ এখানি স্বপ্নাদেশ"। এই বলিয়া তিনি অন্নদাঠাকুরের অলৌকিক জীবনকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল অলৌকিক ঘটনাবলী আমার স্মৃতিমন্দিরে রাখিয়া দিয়াছিলাম—উপেক্ষাভরে নয়—অন্য কারণে। এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রখর আলোকে সে গুলিকে আমি বাহির করিতে চাই নাই; এই পাথুরে প্রমাণের যুগে কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য সেগুলিকে উপস্থিত করিতে চাই নাই।

সে যাহা হউক, এখন বিচার করা যাউক—স্বপ্নাদেশ ব্যাপারটা কি। এ সম্বন্ধে সেকালের মুনিঋষিরা নাকি যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। আমি সে সব পড়ি নাই; সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা করিব না। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত অধ্যাপক ফ্রয়েড এই স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বেও দুই চারি জন বিলাতী অধ্যাপক ও কয়েক জন থিয়সফিষ্ট এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তবে অধ্যাপক ফ্রয়েডই স্বপ্নতত্ত্বকে Experimental Psychology বা পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। বাংলা ভাষাতেও স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একখানি বই এবং দুপাঁচটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক ফ্রয়েড বলেন আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজ, আর সেই সঙ্গে অনেক চিন্তাধারা পূর্ণতা লাভ করে না; এই অপূর্ণ চিন্তাধারাই স্বপ্নে পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে। স্বপ্নে চিন্তার বা ভাবের একটা ধারা একটা সংযোগ লোকে খুঁজিয়া পায় না; অনেক আজগুবি ব্যাপারও স্বপ্নে দেখা যায়। অধ্যাপক ফ্রয়েড বলেন, স্বপ্নে আজগুবি কিছুই নাই; যাহা নিতান্ত বিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা বিক্ষিপ্ত নয়; সে সবই অসম্পূর্ণ ও সুপ্ত চিন্তার ধারা; তাহাদের সংযোগস্থল আছে। তিনি তাহার পন্থা বলিয়া দিয়াছেন। সে পন্থার ইংরেজী নাম Free Association Method বা 'অবাধ ভাবানুবন্ধ প্রণালী'। এই প্রণালীতে ক্রিয়া করিলে স্বপ্নের ঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। স্বপ্নের যে সব কথা নিতান্ত অসংলগ্ন বলিয়া প্রথমে বোধ হয়, স্বপ্নদ্রষ্টাকে ক্রমাগত উক্ত প্রণালীতে জেরা করিয়া তাহার বেশ সুসংলগ্ন অর্থও পাওয়া গিয়াছে। অতএব ইহা হইতে পাওয়া গেল এই কথা যে, স্বপ্ন অলীক কল্পনা বা পল্লিকার ফল নয়; তাহার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। আপনারা ঐ Free Association Method বা অবাধ ভাবানুবন্ধ প্রণালীর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আমি আপনাদের তরফ হইতে যে বাগাড়ম্বর করিলাম তাহাতে মনস্তত্ত্ববিদের নিকট

হইতে আদায় করা গেল এই যে, স্বপ্ন অসম্পূর্ণ বা সুপ্ত কার্য্য বা চিন্তাধারার অভিব্যক্তি, স্বপ্নাদেশ সুপ্ত বা জাগ্রৎ সাধনাধারার অভিব্যক্তি। এইবার যদি কেহ তর্ক করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে প্রণাম ও সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইব। কারণ স্বপ্নাদেশ বা প্রত্যাদেশকে আমি তর্কের অতীত স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছি। তিনি আমার বিশ্বাসের দুর্গের মধ্যে অটল প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি তর্ক, গবেষণা সে দুর্গপ্রাকারে খুব জোরে ঘা দিতে পারে কিন্তু তাহাকে ফেলিতে পারে না বা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতেও পারে না। তাই পূজনীয় রাসবিহারী বাবু যেদিন অন্নদাঠাকুরের স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখমাত্র করিয়াছিলেন, সেই দিনই সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলাম ; কোন যুক্তিতর্ক আমার করিবার ছিল না।"

এতাবৎ এই সকল চিন্তাশীল দার্শনিকগণ যে গবেষণামূলক আলোচনা করিলেন তাহাতে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত স্বপ্নাদেশে সত্যের সন্ধান পাইলেন। অতঃপর এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইতে অদ্যাবধি ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং দেখিয়া বিস্মিত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছি এমন কতকগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা ক্রমে আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে এই আদেশবাণীর মূলতত্ত্ব সেই ঈশ্বরদর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মতামত দুই এক কথা যাহা শুনিয়াছি তাহাও উল্লেখ করিব।

প্রচার হইয়াছে আদ্যাপীঠে ভগবান ভক্তকে দর্শন দিবেন। শুনিয়াই হয়ত কেহ মনে করিবেন সেই কবির কথা—

সে কি আমার মত তোমার মত রামার মত শ্যামার মত
ডালা কুলো ধামার মত যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে।

তাই ত ; ভগবানকে যে সে যখন তখন যেখানে সেখানে দর্শন করিবে ? না না তা নয় ; তবে হাঁ, তিনি দর্শন দেন একথা যথার্থই সত্য। শাস্ত্রে আছে মায়ের দেহান্তের পর নারদ যখন ঈশ্বরান্বেষণের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিলেন তখন নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক একদিন তিনি গভীর অরণ্যে এক বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে তিনি এক দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিলেন ; দৈববাণী হইল—

হন্তাস্মিন জন্মনি ভবান্নমাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং তুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্‌॥

হায়! এ জন্মে তুমি আমাকে দেখিবার যোগ্য হও নাই; যাহারা কামাদি দগ্ধ করে নাই সেই কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় না। তথাপি—

সকৃৎযদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায়তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান॥

এই যে একবার দর্শন দিলাম এ কেবল আমার প্রতি তোমার আকর্ষণের জন্য; আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলে সাধু ধীরে ধীরে হৃদয়ের সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

তাহা হইলে সত্যই ভগবান কৃপা করিয়া দর্শন দিয়া থাকেন। দর্শনের ফল অবশ্য বিভিন্ন হইতে পারে। যে দর্শনে আত্মার চরমোৎকর্ষ জীবের শিবত্ব লাভ হয়—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া।
ক্ষীয়ন্তে চাস্তকর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই দর্শনে হৃদয় তুয়ার খুলিয়া গিয়া সমস্ত সংশয় দূর হয়; সে দর্শনের পর জীবের আর কর্ম্ম থাকে না। বাসনার শেষে কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেলে সেই যে দর্শন তাহাতে সাধনার সমস্ত সিদ্ধি পর্য্যবসিত। আর নারদ প্রথম অবস্থায় যে দর্শনলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে লাভ করাই জীবের একমাত্র কাম্য এই বিশ্বাস সাধকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া তাহাকে সাধনায় ব্রতী করে। সে যাহাই হউক, এই দর্শনও একমাত্র ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। এই সকৃৎদর্শনে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করিয়া যে সাধক নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী হয় তাহার দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ; যে দেবালয়ে এরূপ দর্শনলাভ হয় সেখানকার দেবতা জাগ্রত। দেবতা জাগ্রত হইলে শুধু দর্শন নয়, নানাভাবে অনুষ্ঠানে দৈবশক্তির অসংখ্য প্রমাণ

প্রত্যক্ষ করা যায়। কয়েকটী প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া জাগ্রত দেবতার এই করুণাধারা অনুধাবন করিতে আমরা চেষ্টা করিব। ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা অনেকেই জীবিত আছেন। পাঠকপাঠিকা এগুলিকে গঞ্জিকা-প্রসূত মনে করিয়া উড়াইয়া দিবার পূর্ব্বে সেই সকল ব্যক্তিবৃন্দের নিকট অনুসন্ধান করেন ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। ঘটনাগুলি এইরূপ—

১। মঠের ব্রহ্মচারিগণ প্রতিদিন সন্ধ্যায় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পুরাতন আদ্যাপীঠে একদিন সন্ধ্যায় মন্দিরের বারান্দায় তাঁহারা কীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময় সম্মুখের বাড়ীর এক ব্যক্তি বাটীর বাহির হইয়াই দেখে যে কীর্ত্তনের মাঝে মন্দির দুয়ারে পরিষ্কার একখানি লাল পাড় সাড়ী ও মাথায় মুকুট পরা একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে ঐ স্ত্রীমূর্ত্তির চারিটি হাত। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া লোকটি আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া আনিয়াছে; এমন কি সে স্থান হইতে প্রায় পনর মিনিটের পথ দূরে তাহাদের এক আত্মীয় এই আদ্যাপীঠের কথা অবিশ্বাস করিত বলিয়া তাহাকে পর্য্যন্ত ডাকাইয়া আনা হইয়াছে। ব্রহ্মচারিদের কীর্ত্তন শেষ হইলে তাঁহাদের একজন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ত কাছে ছিলেন; কেমন দেখ্‌লেন?" ব্রহ্মচারীরা কিছুই দেখেন নাই। তাঁহারা বলিলেন, "কই? আমরা ত কিছু দেখিনি; কি বল্‌ছেন?" "সে কি? মা দু ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন, আর আপনারা দেখেন নি? সে কি কথা?" ঠাকুরমহাশয়ও সেখানে ছিলেন; তিনিও তখন দেখেন নাই; পরে তিনি রাত্রে ৺মায়ের নিকট ধন্না দিলে আদেশ হয় "হাঁ, ওরা আমার লীলাময়ী মূর্ত্তি দেখেছে; মূর্ত্তি দু ঘণ্টা নয়, ৪৮ মিনিট ছিল; এর ফলে ওরা আগামী জন্মে উচ্চ বংশে জন্মলাভ করে আমার নাম প্রচার কর্‌বে। ওদের প্রসাদ পাইয়ে দে।"

বলা বাহুল্য মূর্ত্তিদর্শনাবধি এই সব লোকের নিকট আদ্যাপীঠ প্রত্যক্ষ দেবতার স্থান। আদ্যাপীঠের যে কোন কার্য্যে ইহারা কায়মনঃপ্রাণে সাহায্য করিতে সদাই প্রস্তুত; আশ্রমের কোনরূপ কাজে লাগিতে পারিলে তাঁহারা কৃতার্থ বোধ করেন।

২। আদ্যাপীঠের প্রতিবেশী কোন মুসলমান আশ্রমের উপর বিশেষ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল; পূজা আরতির কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি তাহার অত্যন্ত ক্লেশদায়ক বোধ হইত। সে একদিন স্বপ্ন দেখিল এক দল দস্যু যেন তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে; দস্যুগণ তাহার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইলে অকস্মাৎ এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। দস্যুদল পলায়ন করিল। তখন দেবী তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া আদ্যাপীঠের মন্দিরপথে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমি এই মন্দিরেই থাকি।" স্বপ্নভঙ্গে সেই রাত্রেই লোকটী আদ্যাপীঠে আসিয়া ভক্তিভরে ৺মায়ের চরণামৃত গ্রহণ করিল।

৩। অর্থাভাবে কোন এক সময়ে এক পর্ব্বদিবসে আদ্যাপীঠে দেবসেবার নিয়মিত অনুষ্ঠানের ত্রুটী হইতে বসিয়াছে। ৺মা এক ভক্তকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "ওরে সকালে আদ্যাপীঠে পূজা দিয়ে আসিস্; নইলে কাল আমার ভোগ হবে না।" প্রভাতে আশ্রমে আসিয়া ভক্ত দেখেন ঘটনা সত্য; তখন তাঁহারই অর্থে সেদিনের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

৪। গ্রামে একদা কোন গৃহস্থের এক বালক পীড়িত। বালকের মাতাকে যেন এক দেবী আসিয়া স্বপ্নে আদেশ করিতেছেন "ওরে তোর ছেলে ভাল হয়ে যাবে; আদ্যাপীঠ থেকে আমার চরণামৃত এনে খাইয়ে দিস্।" বলা বাহুল্য ঐরূপ করায় বালক আরোগ্যলাভ করিল।

৫। আদ্যাপীঠ নূতন জমিতে উঠিয়া আসিবার সময় এক দিন সন্ধ্যা আরতির পরে পুরাতন আদ্যাপীঠে ভাবাবেশে এক ব্রহ্মচারী ৺মায়ের পটে আঘাত করিয়া কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাত্রি প্রভাতে গ্রামবাসী কোন প্রাচীনের মুখে শুনা গেল নূতন জমিতে অতি প্রত্যূষে তিনি এক দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন।

৬। স্বর্গীয় অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের দেহান্তে আদ্যাপীঠে ব্রহ্মচারিগণ সাধারণ সভায় যখন কার্য্যকরী সমিতির পুনর্গঠন করিতেছিলেন প্রতিপক্ষ তখন পুলিশের সাহায্যে সভা পণ্ড করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে সময় আদ্যাপীঠের প্রতিবেশী কোন ভদ্রলোক আশ্রমের বিরুদ্ধে পুলিশের নিকট অনেক কিছু বলিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি মঠের এক বিশিষ্ট কর্ম্মীর নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া অতি কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন যে, লোকের কথায় তিনি আদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে কথা কহিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বদিন রাত্রে ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দিয়া জানাইয়া গিয়াছেন, "এখানে ভগবানের কাজ হচ্ছে; তোরা দেখাশুনা করিস্"। তদবধি এই ভদ্রলোক সকল বিষয়ে আদ্যাপীঠের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

৭। ঠাকুরমহাশয়ের দেহান্তের পর মঠবাসী কোন ভক্ত ভাবিলেন, 'তাই ত! ঠাকুরের আকর্ষণে সব ছেড়ে মঠে এলাম; এখন কোথায় বা ঠাকুর? আর কোথায় বা পরমহংসদেবের আদেশ? যে হাঙ্গামা সুরু হয়েছে তাতে আদ্যাপীঠ ছেড়ে না পালাতে হয়।' এইরূপ ভাবিয়া রাত্রে নিদ্রাগমে তিনি স্বপ্ন দেখেন, হাতে দুই চারি পাতা তামাক লইয়া স্বয়ং পরমহংসদেব দ্বারদেশে দণ্ডায়মান! হাসিমুখে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি হে? তোমাদের মন্দিরের কতদূর কি আয়োজন হল?" ভদ্রলোক তামাকপাতা ব্যবহার করিতেন। নিদ্রাভঙ্গে মহানন্দে সকলকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া নিজ সংশয় সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

৮। আদ্যাপীঠে সন্ধ্যা আরতির সময় পাড়ার ছেলে মেয়েরা জুটিয়া থাকে। এক দিন আরতির পর স্তবস্তুতি হইয়া গেলে সমবেত বালক বালিকাদিগকে প্রসাদ দেওয়া হইল। সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলে দেখা গেল, ৯।১০ বৎসরের একটী বালিকা প্রসাদ হাতে লইয়া স্থির দৃষ্টিতে ৺মায়ের মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া আছে। কিছু ক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে বালিকাটী ধীরে ধীরে এমন সমস্ত অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল যে তাহাতে একটা নীরব পূজাপ্রকরণ লক্ষিত হয়। বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় সে এক মানসোপচার পূজায় মেয়েটী কয়েক দণ্ড অতিবাহিত করিল। অবশেষে বক্তার হইয়া সে উপস্থিত অনেককেই অনেক কথা বলিল। পাড়াপড়শী শতাধিক লোক সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই ক্ষুদ্র বালিকার মুখে অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক উক্তি শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। কত লোকের কত কূট প্রশ্নের সুমীমাংসা সেই বালিকার মুখে সকলে শুনিল। কেহ বলিল, ভর হইয়াছে; কেহ বলিল, ভাব হইয়াছে; কেহ বা বলিল, ইহা দেবতার আবেশ। এইভাবে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমবেত জনমণ্ডলীর কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া মেয়েটীর অভিভাবকগণ তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন। শুনা যায় কিছুদিন মেয়েটীকে রীতিমত পাহারা দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। আদ্যাপীঠে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলেই মেয়েটী অস্থির হইয়া উঠিত। কিন্তু সেদিনের সেই জনসমাগম ও নানা জনের নানা মত দেখিয়া মেয়েটীর অভিভাবকগণ তাহাকে আর বাটীর বাহির হইতে দেন নাই। এখন বাটীতেই তাঁহারা ৺মায়ের ছবি রাখেন এবং মধ্যে মধ্যে ৺মায়ের চরণামৃত ও প্রসাদ লইয়া যান।

৯। আদ্যাপীঠের জীর্ণ শিবমন্দিরগুলির তিনটী সংস্কার হইবার পর বহুদিন যাবৎ মন্দির সংস্কারকার্য্য অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ তিন শত টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ ঋণের টাকায় সংস্কারকার্য্য চালাইবার অভিপ্রায়ে মন্দিরের উপরিস্থ বৃক্ষাদি কাটান

হইতেছে ; সাড়ে পাঁচ শত টাকায় আমূল সংস্কারের চুক্তি দিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে ; এমন সময় বরিশাল নিবাসী এক যুবক অতিথি আদ্যাপীঠে সপ্তাহকাল অবস্থানপূর্ব্বক আশ্রমের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গোপনে সমস্ত সন্ধান রাখিয়া সে অকস্মাৎ এক রাত্রে লোহার সিন্ধুক হইতে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। ঐ তিন শত টাকার সহিত আশ্রমগৃহ নির্ম্মাণের আরও চারি শত টাকা ছিল। এই নগদ সাত শত টাকা ও সোনা রূপায় মোট প্রায় হাজার টাকা আশ্রমের দলিলপত্র সহ অপহৃত হইল। আশ্রমের সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মন্দির সংস্কার ও গৃহনির্ম্মাণের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সকলে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবানের কি লীলা! যে শিবমন্দির সংস্কারচেষ্টায় অর্থসংগ্রহে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ঋণদ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিতে হইয়াছিল, চোরের উপদ্রবে তাহাও বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে তখন অজ্ঞাতনামা এক দাতা ভক্ত আরব্ধ কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাড়ে পাঁচ শত টাকার সমস্ত ভার লইয়া কাজ চালাইয়া দিলেন। আমাদের ব্রহ্মচারী হেমন্তভাই মারফৎ এই মহাপ্রাণ তাঁহার এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। মহাদেবের এই অপূর্ব্ব মহিমা যে ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে আজ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার পরিচয় জানি না। সাড়ে পাঁচ শত টাকার ভার লইয়া তিনি এতাবৎ ঐ মন্দির বাবদ সহস্রাধিক টাকা খরচ করিয়াছেন।

শুধু কি এই দান? ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, পুলিশ যাহা কিছুতেই আশা করিতে পারে নাই, পূর্ব্বোক্ত চুরির ঘটনায় তাহাই ঘটিল। দশ জন যুবকের মধ্য হইতে লোহার সিন্ধুক খুলিয়া যে চোর সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক বেমালুম চম্পট দিল, সে কি না পনর দিন পরে খুলনায় ধরা পড়ে! আবার শুধু ধরা নয়, বমালসমেত ধরা পড়িয়া সে

শান্তিভোগ করিতে লাগিল; আর সামান্য কিছু বাদে অপহৃত দলিলপ সহ হাজার টাকা প্রায় সমস্তই আমরা ফেরৎ পাইলাম।

১০। ৺মায়ের আদেশ আছে "ভক্তের ঘরে ঘরে আমার প্রচার কর।" এই আদেশমত দুইজন প্রচারক একবার ৺মায়ের ছবি ও স্তবাদি বিতরণ করিতে করিতে ধানবাদের নিকট কুসুণ্ডায় জনৈক কলিয়ারী ম্যানেজারের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখেন সেখানে ৺মায়ের রীতিমত পূজা চলিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া প্রচারকগণ শুনিলেন, ইডেনগার্ডেন হইতে ৺মায়ের মূর্ত্তি তুলিয়া যে গৃহস্থের বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল সেই গৃহস্থের এক সন্তান ঐ ম্যানেজার মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া ম্যানেজারি পড়িতেন। যতদিন তিনি সেখানে ছিলেন নিত্য সেই পটের পূজা করিতেন; পরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলে ৺মায়ের পট দেয়ালেই টাঙ্গান ছিল। ক্রমে ছবির কাচের উপর স্তরে স্তরে ময়লা পড়িয়া ছবি একরূপ নষ্ট হইতে বসিয়াছে; কিছুদিন পরে যখন ম্যানেজারবাবু সেই স্থানে তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া আসিলেন তখন হঠাৎ একদিন তাঁহার স্ত্রী স্বপ্ন দেখেন যেন ৺মা বলিতেছেন, "ওরে আমাকে কি এমন করে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তে আছে? আমায় ফুল চন্দন দিয়ে পূজা কর্‌তে হয়; স্তব পাঠ কর্‌তে হয়।" ম্যানেজার বাবুর স্ত্রী পরদিনই ছবিখানি নামাইয়া তাহার ময়লা পরিষ্কার করিয়া ঘরের এক কোণে স্থাপনপূর্ব্বক ফুল জল দিয়া ৺মায়ের পূজা করিয়াছেন। সেই রাত্রে আবার স্বপ্ন হয়, যেন ৺মা বলিতেছেন, "ওরে আমায় কি মাটিতে রাখ্‌তে আছে? একখানি কাঠের আসনের উপর রাখ্‌তে হয়।" গৃহকর্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তখন জলচৌকির উপর আসন পাতিয়া ৺মাকে রাখিলেন। তদবধি সে গৃহে ৺মায়ের নিত্যপূজা যথাবিধি চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ম্যানেজারবাবু এবিষয়ে কোন আগ্রহ করেন নাই; এবারে

তিনি প্রচারকদিগকে সঙ্গে লইয়া স্থানীয় খনিগুলি সমস্ত ঘুরিলেন; এবং নিজ গৃহের ঘটনা বিবৃত করিয়া প্রত্যেককে ৺মায়ের মূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন।

১০। স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয়ের জনৈক বন্ধু বাগবাজারে থাকেন; ইনি বি এস্ সি, বি এল্ উপাধিধারী জনৈক পাশ্চাত্যশিক্ষিত ব্যক্তি। ঈশ্বর আছেন কি না এই বিষয় লইয়াই এককালে ইনি কত লোকের সহিত কত তর্ক করিয়াছেন। কিন্তু আদ্যামূর্ত্তিপ্রাপ্তি হইতে ভগবান রামকৃষ্ণের আদিষ্ট কর্ম্ম পর্য্যন্ত ঠাকুরমহাশয়ের জীবনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। সেইজন্য আদ্যামায়ের একখানি ছবি তিনি তাঁহার ঘরে রাখিয়াছিলেন; প্রত্যহ স্নানের পর একবার করিয়া ৺মাকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। একদিন প্রণাম করিতে গিয়া দেখেন অদ্ভুত ব্যাপার! ৺মায়ের মূর্ত্তি যেন সজীব! শ্বাস প্রশ্বাসে যেন ৺মায়ের বক্ষ স্পন্দিত হইতেছে! এ কি সম্ভব! তিনি চক্ষু মুছিয়া এদিকে ওদিকে সম্মুখে পশ্চাতে নড়িয়া সরিয়া নানাভাবে দেখিতে লাগিলেন; সকল দিক দিয়াই সেই স্পন্দন লক্ষ্য হয়! ইহাকে ত দৃষ্টিবিভ্রম বলা চলে না! একবার মনে হইল হয় ত ছবিখানি বাতাসে নড়িতেছে; তাই ঐরূপ বোধ হইতেছে। ভদ্রলোক বিজ্ঞানের দিক দিয়া অনুপাতের হিসাব করিয়া দেখিলেন বস্তুটী নড়িলে তাহার ছায়াও নড়িবে। কিন্তু কই? ছায়া ত মোটেই নড়ে না! যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া শেষে তিনি ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যে ব্যক্তি দুই মিনিটে কাজ সারিয়া আহারে বসেন আজ তাঁহার অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী উপরে গিয়া দেখেন, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই আদ্যামূর্ত্তির পানে তাকাইয়া নিশ্চলভাবে তাঁহার স্বামী দণ্ডায়মান; দুই চক্ষে ধারা বহিতেছে।

১১। ইডেন গার্ডেনের ঝিল হইতে উঠাইয়া স্বর্গীয় ঠাকুরমহাশয় যে গৃহস্থের বাটীতে ৺আদ্যামায়ের মূর্ত্তি রাখিয়াছিলেন, ৺মায়ের মূর্ত্তি

বিসর্জ্জনের কিছুকাল পরে সেই গৃহস্থের কনিষ্ঠ পুত্র কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়। ঠাকুরমহাশয় তখন অন্যত্র থাকিতেন; পীড়ার সংবাদে রোগীকে দেখিতে গিয়া তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল যদি ছেলেটির কিছু হয় তাহা হইলে লোকে বলিবে, রাক্ষসী মাকে বাড়ীতে আনিয়া ছেলেটী গেল। এই মনে করিয়া তিনি কায়মনোবাক্যে ৺মাকে জানাইলেন, "মা! এদের বিপদ হলে তোমার নামে কলঙ্ক হবে; আর কেউ তোমার পূজা কর্‌বে না; লোকে তোমার নাম নিতে ভয় পাবে।" সেই রাত্রেই ঠাকুরমহাশয় স্বপ্ন দেখিলেন, আলুলায়িতকেশা জীর্ণবাসা এক বৃদ্ধা তাঁহাকে বলিতেছে,

'আমায় যেমন করে রেখেছে আমি তার উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি; আমায় পূজা কর্‌বে বলে নিয়ে—অনাদর?—যেখানে সেখানে ফেলে রাখা?—এর ফল যাবে কোথা?'

নিদ্রাভঙ্গে ঠাকুরমহাশয় গিয়া গৃহকর্ত্রীকে সকল কথা শুনাইলেন। মা বলিলেন, 'ঠাকুর! আমি ত জেনে শুনে ৺মাকে অযত্ন করি না; তবে দুখানি ফটো আমি নিয়েছিলাম; এক খানি বাঁধিয়ে রেখেছি; আর এক খানি যে কোথায় গেল খুঁজে পাই নি।' এই বলিয়া সকলকে লইয়া মা হারাণ ফটো খুঁজিতে লাগিলেন। দুই দিন পরে রোগীর ঘরের বারান্দায় কতকগুলি ছেঁড়া কাপড়ের নীচে জঞ্জালের মধ্যে ফটোখানি জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন ঠাকুরমহাশয়ের কথামত সযত্নে বাঁধাইয়া সেই ফটোর পূজা করিলে ধীরে ধীরে গৃহস্থের পুত্র আরোগ্যলাভ করিল।

১২। আদ্যাপীঠে একবার রামনবমীর উৎসবের সময় নিতান্ত অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। উৎসব বন্ধ হইতে পারে না; কাজেই স্থির হইল যথাসাধ্য ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া তখনকার মত ঋণদ্বারা উৎসব কার্য্য সম্পন্ন

করা হউক। উৎসবের আর দেরী নাই; ঋণের আবেদন হইয়াছে এমন সময় ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের নামে সিঙ্গাপুর হইতে একশত দশ টাকার এক চেক সিঙ্গাপুর হইতে আসিয়া পৌঁছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র ভূবণ পাল নামক সিঙ্গাপুরপ্রবাসী জনৈক ডাক্তার আদ্যাপীঠে ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই এই টাকা পাঠাইয়া দেন। ডাক্তারবাবুকে জানান হইল তাঁহার টাকা আশাতীতভাবে উৎসবের কার্য্যে লাগিয়াছে। তিনি উত্তরে লিখিলেন, তাঁহার অর্থ ঐভাবে ব্যয় হওয়ায় তিনি পরম আনন্দিত; তবে তিনি কিছুই জানিতেন না; অন্তরে একটা প্রেরণা হওয়ায় কিছু অর্থসাহায্য পাঠাইয়াছিলেন মাত্র। তদধিক তিনি কিছুই জানিতেন না।

সত্যই ভদ্রলোক কিছু জানিতেন না; মানুষ কতই বা জানিতে পারে। তবে এইটুকু জানিতে পারা যায় যে ঠাকুরমহাশয়ের এই অমূল্য জীবন অবলম্বনে এই যে ৺আদ্যামায়ের আবির্ভাব, এই যে ভগবান রামকৃষ্ণের আদেশ, এই যে আদিষ্ট মন্দিরে ঈশ্বর দর্শনের আশা, এই সমস্ত কথা যুক্তিতর্ক সাহায্যে প্রথম শ্রবণে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও এই সকল ঘটনা লক্ষ্য করিলে ভগবৎবিশ্বাসীমাত্রেই বুঝিবেন এই ব্যাপারের পিছনে এমন এক তত্ত্ব নিহিত আছে, এই প্রচারে এমন এক সত্যের প্রকাশ আছে যাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পাশ্চাত্য জড়বাদ ও দেহাত্মবুদ্ধি আদৌ সমর্থ নয়। জড়বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্ক এই সত্যের সন্ধান না পাইলেও ইহা প্রত্যক্ষ বস্তু। প্রত্যক্ষ কখনও উপেক্ষা করা যায় না।

এইরূপ প্রামাণিক ঘটনা নিয়তই ঘটিতেছে। জাগ্রত দেবতার স্থান এই আদ্যাপীঠের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিলে এক বিরাট গ্রন্থ হইয়া যায়। আদ্যাপীঠের উৎপত্তি হইতে এক যুগ অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যে এই পুণ্যধামের আশ্রয়ে যাঁহাদের জীবন ধন্য হইতেছে তাঁহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে দেবতার কৃপাই এখানকার সহায় সম্বল।

শ্রবণমাত্রে একথা বুঝিতে পারা যায় না; ইহা অনুভব করিবার বিষয়। একান্ত আগ্রহে যিনি এখানে জীবন অতিবাহিত করিতে চান, প্রীতি ভক্তিসহকারে যে জিজ্ঞাসু ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই এখানকার আনন্দ আস্বাদ করিতে সমর্থ হন। সে আস্বাদনের জন্য চাই পিপাসা, চাই জিজ্ঞাসা, চাই আত্মসমর্পণ। ঝাঁপাইয়া পড়; তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিবেন; ইহাতে আর সংশয় নাই।

এস্থলে একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। মনে করুন, কোন মৎস্যশিকারী শুনিলেন, এক পুষ্করিণীতে বহু মৎস্য আছে; তখন তিনি কি করিবেন? তিনি চার করিয়া ধৈর্য্যসহকারে সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া পুষ্করিণীপাড়ে শিকারের চেষ্টায় অব্যর্থ লক্ষ্যে শিকারসাধনে বসিবেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাইলেই যদি সে জলাশয়ে মৎস্য থাকে তাহা হইলে এখানে ওখানে মাছের ঘাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন প্রমাণ হইবে সত্যই সেই জলাশয়ে মৎস্য আছে; ধৈর্য্য ধরিলে মৎস্যলাভ অসম্ভব নহে। আস্থাপীঠ সম্বন্ধেও সেইরূপ অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে ভগবৎকৃপালাভের আশায় কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া যাঁহারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা ভগবান তাঁহাদিগকে জানাইতেছেন যে সত্যই তিনি আছেন। ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিলে আদেশ অনুযায়ী প্রস্তুত মন্দিরে ভাগ্যবান ভক্ত যে তাঁহার দর্শনলাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব

ভগবান রামকৃষ্ণের নামে আজ বহু সঙ্ঘ সমিতি দেশে বিদেশে নিত্য জন্মলাভ করিতেছে। রামকৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বী বহু সাধু সজ্জনও বহু সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিতেছেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান হিসাবে এতদ্দেশে এই সকল অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটীর এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানটী সমাজের কোন না কোন কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত আছে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি যে এই কল্যাণ মানুষের জন্য মানুষ যাহা করিতে পারে তাহার অধিক কিছুই নহে। এরূপ সাধারণ কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিবরণ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। এবম্বিধ অনুষ্ঠানগুলির বিভিন্ন এবং বিচিত্র উদ্দেশ্য সমস্তই মানববুদ্ধিপ্রসূত। আমাদের আলোচনার বিষয় এই দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ভগবানের আদেশে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গগৌরব স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ভগবান রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আদেশে কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন সেইরূপ অথবা ততোঽধিক শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর ভগবানের অলৌকিক দর্শনলাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে জীবের উদ্ধারকল্পে এক বিচিত্র অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণ যখন স্বর্গীয় অন্নদাঠাকুর মহাশয়কে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'অন্নদা, আজ তোমার জীবনের শেষ দিন ; এখন তুমি কি চাও ?' তখন পর্য্যন্ত ঠাকুরমহাশয় জানিতেন না যে তাঁহার উপর এই কার্য্যভার অর্পিত হইবে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায়, এই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি মানববুদ্ধিপ্রসূত নহে। যাঁহার কৃপাই জীবের একমাত্র গতি মুক্তি সেই ভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশে এই অনুষ্ঠানের জন্ম কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত। ইহাই এই অনুষ্ঠানের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

ভগবান রামকৃষ্ণের নামে আজ সমগ্র জগদ্ব্যাপী যে আধ্যাত্মিক

আন্দোলন চলিতেছে, জানি না কয় জনে তখন তাহার ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল যখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এই নরেনকে দিয়ে আমার কাজ হবে"। সাধারণ মানুষ তাহা ধারণা করিতে পারে না। অবতার পুরুষদিগের কার্য্যকলাপ গূঢ় উদ্দেশ্যমূলক হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই তাহার ফলাফল জনসাধারণ সুদূর ভবিষ্যতে উপলব্ধি করিতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণী—"ষ্টীমারখানি সামনে থেকে চলে গেলে তবে তার ঢেউ তীরে পৌঁছায়।" অবতার পুরুষদিগের কার্য্যধারাই এই। যেমন একটী ক্ষুদ্র পক্ষী লোকচক্ষুর অগোচরে এক মন্দির-শিখরে পুরীষ ত্যাগ করিয়া গেল; কেহ জানিল না ঐ পুরীষমধ্যে বিশাল মহীরুহের বীজ সেই ক্ষুদ্র বিহঙ্গ দান করিয়া গেল। কালক্রমে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল; ধীরে ধীরে শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া সেই অঙ্কুর মহামহীরুহে পরিণত হইল এবং ভূগর্ভবিস্তারী তাহার মূলগুলি মন্দিরের অণু পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। দৈবকার্য্যের ফলাফল সেইরূপ সাময়িকভাবে সাধারণের বুঝিবার সাধ্য নাই। তাই জনসাধারণ বুঝিতে অসমর্থ হইলেও আদেশ অনুযায়ী আমরা বলিয়া থাকি ভগবানের আদিষ্ট এই কার্য্যই দেশের ও দশের সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল উৎস বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মানবাত্মা উন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করে ঈশ্বরকৃপালাভে বা ঈশ্বর দর্শনে। আদেশ আছে প্রতি বৎসর ভগবান এই মন্দিরে ভক্তকে দর্শন দিবেন। একমাত্র এই ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত হৃদয় শান্তি তৃপ্তি আনন্দ লাভ করিতে পারে না। ভগবানের কৃপায় এখানে জীব সেই ঈশ্বরদর্শন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিবে ইহাই এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

ভগবান দর্শন দিয়া থাকেন একথা শুনিয়া শিক্ষার দোষে স্থূল

কলেজের বালক ও নাবালকগণ অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেও যুগাবতার রামকৃষ্ণের শ্রীমুখে সকলে শুনিয়াছে—

"আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হত এই চক্ষু দিয়ে; যেমন আমি তোমায় দেখ্‌ছি।" ১

"শুধু দর্শন নয়; কথা কয়েছে। বটতলায় দেখ্‌লাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে—তারপর কত হাসি! খেলার ছলে আঙ্গুল মট্‌কানো হল। তারপর কথা—কথা কয়েছে।" ২

"তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন আর কথা কন।" ৩

ভগবানকে যে দেখা যায় সে কথা সত্যই আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বিজাতীয় শিক্ষার আদর্শে জড়বাদ ও নাস্তিকতা আমাদের দেশে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে নরেন্দ্রনাথ (বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ) তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও সাধু সন্ন্যাসী সাধক প্রচারক কাহারও মুখে একথা শুনিতে পাইলেন না যে ঈশ্বর আছেন; তাঁহাকে দেখা যায়। একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহাকে এই বাণী স্পষ্টভাবে শুনাইলেন। তাহাতেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট নত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের কি খেলা! যে স্বামীজির প্রচারফলে সমগ্র জগৎ আজ রামকৃষ্ণ নামের জয় গাহিতেছে সেই স্বামীজির প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানে সেবা আছে সাধনা আছে, কর্ম্ম আছে জ্ঞান আছে, বেদ বেদান্ত ষড়দর্শন সবই আছে, এমন কি বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের পঠন পাঠন, খৃষ্ট মহম্মদের যজন যাজন পর্য্যন্ত হয়

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪র্থ ভাগ পৃঃ ৪

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪র্থ ভাগ পৃঃ ২৭৯

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ পৃঃ ৪৭

ত আছে, কিন্তু নাই শুধু সেই রামকৃষ্ণভাব যাহার বিকাশে, যাহার দরশে পরশে অমৃত ভাবে বিশ্বাস হয় ঈশ্বর আছেন; তিনি দয়া করিয়া জীবকে দর্শন দেন; আর সেই দর্শনই জীবের পরম পুরুষার্থ। স্বামীজির শিষ্য প্রশিষ্যগণের মধ্যে সে ভক্তির বিকাশ, সে ভাবের অনুশীলন যেন নয়নগোচর হয় না। মঠ মিশনে পাশ্চাত্যের প্রবল প্রভাব যেন সাত্বিকতার স্থলে রাজসিকতার সেবায় সেবকগণকে বিভোর করিয়াছে! কেহ হয় ত প্রশ্ন করিবেন, তবে কি স্বামীজি ভুল করিয়াছিলেন? না; ভুল করেন নাই; তিনি দেশের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে; দেশের অবস্থা ফিরিয়াছে; এখন অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। কে সেই ব্যবস্থা দিবে? তাঁহার অনুচরবর্গ অবশ্যই নহে। অনুসরণই অনুচরের কার্য্য। তাই বোধ হয় রামকৃষ্ণলীলার এই দ্বিতীয় অঙ্কে যুগাবতারের যুগবাণী এই ঈশ্বরদর্শনের কথা নূতন ভাবে নূতন আধারের মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করিতেছে।

সত্য চিরকালই স্বপ্রকাশ। প্রবীণের ধর্ম্ম যখন প্রাণহীন আচারে পর্য্যবসিত হয় প্রাণময় তখন নবীন মন্ত্রে নবীনের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করেন। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান স্বয়ং ভূভার হরণ করিতে জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব, তাঁহার জন্ম কর্ম্ম, তাহার লীলা খেলা চোখের উপর প্রত্যক্ষ করিয়াও জীব তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। সাধিয়া কাঁদিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বার বার তিনি আপনা বিলাইয়া চলিয়া যান! আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি না। যুগ যুগান্তর পরে 'হা গৌরাঙ্গ! হা রামকৃষ্ণ!' শব্দে গগন বিদীর্ণ করি।

তিনি না চিনাইলে কে তাঁহাকে চিনিবে? আদেশবাণীর মধ্যে আমরা শুনিতেছি ভক্তসঙ্গে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার আসিতেছেন। ইহাতে যাঁহারা প্রশ্ন করিবেন, এই সেদিন তিনি আসিয়াছিলেন; সে আসার উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হইল, যে শীঘ্রই তাঁহার পুনরাবির্ভাব প্রয়োজন

হইয়াছে ? বিবেকানন্দাদি শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা কি তাঁহার কার্য্য যথাযথ সম্পন্ন হইতেছে না ? তাঁহাদিগকে আমরা বলি শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা ভাবধারা সকল সময়ে অনাবিল স্রোতে শেষ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয় না। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা ; দেবলীলার রহস্য সম্যক বুঝিবার বা বুঝাইবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। তাঁহার লীলার রহস্য তিনিই জানেন। তবে তিনি বুঝাইলে বুঝিতে পারিব এই আশায় স্মরণ করি তাঁহার শ্রীমুখের সেই বাণী—

"যারা অন্তরঙ্গ তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।" ১

"আর একবার আসতে হবে ; তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না ; (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই তাহলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন ?"২

এতদ্ভিন্ন লছমনঝোলার আদেশে ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "আমার দেহরক্ষার বত্রিশ বৎসর পরে আমি আবার বাংলায় যাচ্ছি। * * * * * * আমার আট জন অন্তরঙ্গ ভক্ত তোমার মন্দিরের কাজে জীবনপাত করবে। আর আমার গত বারের আঠার জন ভক্ত এক শ আঠাশটী শরীর চালনা করে তোমার কাজের সহায়তা করতে আবার বাংলায় যাচ্ছে।" ৩

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থভাগ পৃঃ ২৭৭

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ পৃঃ ৫৩

৩। স্বপ্নজীবন ১ম খণ্ড পৃঃ ৪১১

আলোচ্য অনুষ্ঠানের এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখন প্রশ্ন উঠিবে—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কি তবে আবার আসিয়াছেন? কোথায় তিনি? কই তাঁহার ভক্তগণ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, অধীর হইবার আবশ্যকতা নাই; পরিচয়ের প্রয়োজন হইবে না। নাট্যশালায় নূতন নাটকের অভিনয়ে প্রাচীরপত্রে অভিনেতাদের নাম দেওয়া না থাকিলেও নাট্যামোদী ব্যক্তি অভিনয় দর্শনমাত্রেই বুঝিয়া থাকেন কে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাই আমরা এ সম্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় না দিয়া শুধু বলিব—বুঝ সুধী যে জান সন্ধান।

ভগবানের আদেশ অনুযায়ী এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও ঈশ্বরদর্শনাদি আরম্ভ হইলে দেশের প্রথম এবং প্রধান লাভ হইবে দ্রষ্টা কর্ম্মী। আদেশ আছে, মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর প্রতি বৎসর অন্ততঃ তিন জন ভক্ত প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া জীবহিতে জীবন উৎসর্গ করিবেন। ইহাই এই অনুষ্ঠানের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য।

দেশ চায় প্রকৃত ত্যাগী কর্ম্মী; দেশের এই অভাব বরাবরই রহিয়াছে কত শত প্রতিষ্ঠান দেশের কাজ করিতেছে; শত সহস্র কর্ম্মী কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; কিন্তু খাঁটি মানুষ কয় জন পাওয়া যায়? ধর্ম্মের আশ্রয় না লওয়ায় উৎপথগামী কত কর্ম্মী জীবন দিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। তাহারা জানে না মুক্তি সাধনার ধন। নীতিধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া কখনও সাধনলভ্য বস্তু লাভ করা যায় না। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল ব্যক্তি বলিয়া থাকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই দেশটা উৎসন্ন গেল; লোকে কর্ম্মশক্তি হারাইয়া জড় হইতে বসিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? না ধর্ম্মের নামে যাহারা কতকগুলি প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠান লইয়া ব্যস্ত তাহারাই ঐরূপ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে? প্রকৃত ধার্ম্মিক কখনও কাপুরুষ হয় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বরং আমরা দেখিতে পাই কর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া সাধনহীন

কত নাস্তিক কর্ম্মের নামে কত বীভৎস অনাচারের অনুষ্ঠান করিতেছে। তাহারা জানে না, এই সমস্যার একমাত্র সমাধান ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়। তাহারা দেখিয়াও দেখে না এই ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়েই আজ গান্ধীচরিত্র ভারতের আদর্শ জগতের পূজ্য। অকৃত্রিম ধর্ম্মবুদ্ধিপরিচালিত বলিয়াই গান্ধীজির কার্য্যপদ্ধতি আজ সমগ্র জগতের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে; গান্ধীজির দৌলতেই আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসমিতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে! নহিলে সর্ব্বত্রই দেখিবে স্বার্থের সংঘর্ষ! ধর্ম্মবিমুখ কর্ম্মীদিগের সমস্ত শক্তি সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের অধঃপতনেই অপব্যয় হইতেছে। আমাদের এই বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীদিগের অবস্থাই ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয়। কে না জানে এ দেশের প্রধান কর্ম্মিগণ এই সেদিন পর্য্যন্ত কতদূর হীন প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? কে না জানে বাংলার ব্যবসাবুদ্ধির নিদর্শন সেই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যঙ্ক যেদিন বিলুপ্ত হইল সেদিন দেশের নেতৃবৃন্দের ধর্ম্মহীন কর্ম্মের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্ববাসী বাঙ্গালীকে কতদূর ধিক্কার দিয়াছিল? শুধু বাঙ্গালী কেন? মানুষের অবস্থাই এই। জীবের হিত, জাতির কল্যাণ, মানুষের কাজ নয়; মানুষ পারে শুধু নিজের কল্যাণ করিতে; আত্মোন্নতির জন্যই এই মানবদেহ ধারণ। অকৃত্রিম নিষ্ঠায় যখন মানব আত্মোন্নতিসাধনে সক্ষম হয়, ভগবানের সে কৃপা যেদিন মানবের সকল চেষ্টা সার্থক করে, কেবল তখনই ভগবানে সমর্পিত সেই দেহমন তাঁহার ইচ্ছা হইলে জীবহিতে বা দেশের কল্যাণে নিযুক্ত হইতে পারে। এই ভাবে মানুষ খাঁটি হইলে ভগবান তাহার উপর তাঁহার কাজের ভার দেন। ইহাকেই বলে চাপরাশ পাওয়া। জাতির কল্যাণ এইরূপ চাপরাশ পাওয়া দ্রষ্টা কর্ম্মী দ্বারাই সম্ভব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—

"লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন ও আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে।

শঙ্করের আদেশ হয়েছিল ; আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুন্‌বে ? নইলে যতক্ষণ কাঠে জ্বাল দুধ ফোঁস করে ফোলে ; কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নেই।”

“আবার মনে আদেশ হলে হয় না ; তিনি সত্যসত্যই সাক্ষাৎকার হন আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত ? পর্ব্বত টলে যায় ; শুধু লেক্‌চার ? দিন কতক লোক শুন্‌বে ; তার পর ভুলে যাবে। সে কথা অনুসারে কাজ কর্‌বে না।”

“যে লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাশ চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্য লোকের। কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ! (হাস্য) হিতে বিপরীত হয়। ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয় ; তবেই কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।”

“আদেশ না থাক্‌লে আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি এই অহঙ্কার হয়।” *

যে দেশ গুরুমুখে এমন অমিয়বাণী শুনিতে পায়, ধর্ম্মহীন কোন প্রচেষ্টায় সে দেশের আস্থা থাকিতে পারে না। মুষ্টিমেয় নির্ব্বোধ কর্ম্মের নামে ধর্ম্মহীন অনাচারে অথবা ধর্ম্মের নামে প্রাণহীন আচারে প্রবৃত্ত

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথমভাগ পৃঃ ৪৭

হইতে পারে ; পুণ্য নামে পাপ পথ প্রশ্রয় পাইতে পারে ; কিন্তু পরিণামে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মের জয়ের মধ্য দিয়াই আমাদের কর্ম্মের আদর্শ পরিস্ফুট। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের এই সমন্বয়েই সমস্ত কর্ম্মযোগের রহস্য লুক্কায়িত।

সমন্বয় সঙ্ঘের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতাবৎ যতদূর আলোচনা হইয়াছে তাহাতে কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সমন্বয় সম্বন্ধে এক নূতন আলোক এই আদেশবাণীর মধ্য দিয়া আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। তদ্ভিন্ন আমরা দেখিতে পাই আদিষ্ট মন্দিরের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান বালক ও বালিকাদিগের জন্য পৃথক পৃথক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম, সংক্রামক-ব্যাধি-নিবারণ-চেষ্টা প্রভৃতি কর্ম্মকেন্দ্রগুলি যেমন কর্ম্মীদিগের একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিবে, ভাবুক ভক্তদিগের ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুলতা, ঈশ্বরোপাসনায় সাধকসাধিকা-দিগের তন্ময়তা সেইরূপ ভক্তিপ্রবাহে অনুষ্ঠানটীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে, আবার আশ্রমাদি শিক্ষায়তনগুলির শাস্ত্রচর্চ্চা ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা সমগ্র প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিবে। আদ্যাপীঠে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া সাধক প্রেমফললাভে জীবন ধন্য করিবে।

ভগবানের এই আদিষ্ট কার্য্য স্থূলদৃষ্টিতে হিন্দুর এক দেবমন্দির মাত্র হইলেও সমন্বয়ের অবতার ভগবান রামকৃষ্ণের ধর্ম্মসমন্বয়সাধনার পরিচয়ও এখানে সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পাইবে। এখনই আমরা দেখিতে পাই আদ্যাপীঠের মন্দিরশীর্ষে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রতীক সসম্মানে রক্ষিত হইয়াছে। শুনিয়াছি আদিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে স্বচ্ছল অবস্থায় যখন পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে তখন মঠের চতুঃসীমানার মধ্যেই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য পৃথক পৃথক প্রার্থনার স্থান নির্ম্মিত হইবে। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান প্রত্যেক ধর্ম্মই এখানে যথোচিত শ্রদ্ধা সম্মান লাভ করিবে। এরূপ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মমন্দিরে আছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের এই বিবৃতি বাক্‌পটু বিশ্বপ্রেমিকের বৈঠকবিজয়ী বক্তৃতা নয়। বিশ্বের আগে দেশের অভাব প্রথমেই দূরীভূত হইয়াছে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার ব্যবস্থা এই আদিষ্ট মন্দিরের বিগ্রহসমাবেশেই লক্ষিত হয়। শ্যাম শ্যামার দেশ এই বাংলায় শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আদিষ্ট মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি, দেবতার পূজাপদ্ধতি ও সেবায়েৎ পূজারীদিগের ভাবভক্তি প্রত্যক্ষ করিলে সমালোচক দেখিতে পাইবেন এখানে শাক্ত বৈষ্ণবের অপূর্ব্ব সম্মিলন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিত্রয়ের প্রথমেই গুরুমূর্ত্তি সনাতন হিন্দুধর্ম্মে গুরুবাদের অবিসম্বাদী স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে; বলিয়া দিতেছে যে অধ্যাত্মবিদ্যা গুরুমুখী; গুরু ভিন্ন, দ্রষ্টার পথনির্দ্দেশ ভিন্ন সেই অজানা অচেনা পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন। গুরুমূর্ত্তির পরেই আছে মাতৃমূর্ত্তি; অর্থাৎ গুরুকরণ দ্বারা অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশলাভ হইলে সাধকের মাতৃভাব সাধন প্রয়োজন হইবে। এই মাতৃমন্ত্রের উপাসনা বৈষ্ণববিরোধী শাক্ত আচার আচরণের নামান্তর নহে। ৺মায়ের পূজায় বিরোধ নাই; ৺মায়ের ডাকেই আমরা শাক্ত বৈষ্ণব সকলে আজ মহামিলনের পুণ্য আয়োজনে ব্রতী; ৺মা আমাদের জগজ্জননী শ্রীশ্রী৺আদ্যাশক্তি। এ সেই মা যাঁহার আরাধনা না করিয়া ব্রজগোপী কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিতে পারে নাই। **৺আদ্যামা পরমা বৈষ্ণবী; ৺মায়ের পূজায় বলির প্রথা নাই।** আদ্যাস্তবের প্রথমেই আছে—

> শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্।
> যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ॥

অন্যত্র আছে মা আমাদের—

> বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।

আরও আছে—

> রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিনী।

অর্থাৎ প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে, বিষ্ণুপ্রীতি বিষ্ণুভক্তি লাভ করিতে হইলে ৺মায়ের পূজা চাই। নারায়ণী ৺মা আমাদের ব্রজে কাত্যায়নী। ৺মায়ের আরাধনা না করিলে প্রাণ ভরিয়া ৺মায়ের নাম না লইলে কাম যায় না। কাম না গেলে প্রেমলাভ হয় না। তাই এই আদিষ্ট মন্দিরে মাতৃমূর্ত্তির পরে প্রেমমূর্ত্তি। প্রেম ভক্তি লাভ করিতে হইলে মাতৃভাব সাধন করিতেই হইবে। তত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই একথা বুঝিবেন। তত্ত্বজ্ঞ না হইলে সাধনা বিপথে পরিচালিত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মাংসভোজী মাতালের মাতৃভক্তি যেমন একদিকে নিরীহ পশুর রক্তধারায় কালী নামে কলঙ্ক লেপন করিতেছে, অন্যদিকে মাতৃভাব সাধনের অভাবে প্রেমের নামে কামের অভিনয় সেইরূপ কৃষ্ণনামে কালি দিতেছে। তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ভেদ বিবাদ চূর্ণ করিয়া দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া সমন্বয়ের এই শুভ সংযোগ মাতৃ সাধনায় সার্থক করিতে হইবে। তবেই শক্তি জাগিবে। ৺মায়ের এই আহ্বান প্রতিনিয়তই আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।

আর ভয় নাই; আর ভাবনা নাই। নিরাশ নিশ্চেষ্ট হইয়া আর বসিয়া থাকিতে হইবে না। শুভদিন আসিয়াছে; আমাদের দুর্গতির শেষ হইয়াছে। করুণাময়ের করুণানির্ঝর এইবার অমৃতসিঞ্চনে আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া ভগবানের আশীষকুসুম শিরে লইয়া চাপরাশ পাওয়া দ্রষ্টা কর্ম্মী এইবার জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবেন। আর কি! এখন—

'দাঁড় ধরে ভাই বস রে সবাই টান রে সবাই টান।'
পারের তরীর আজ কাণ্ডারী স্বয়ং ভগবান॥





আত্মাপীঠের কর্ম্মীবৃন্দ

কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর

ভগবানের আদেশবাণী সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গ নানা প্রশ্নের উত্থাপন করেন। আলোচ্য পুস্তিকায় যথাসম্ভব বিশদ আলোচনা সত্ত্বেও যে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার যথাযথ উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। দেশে এত মন্দির থাকিতে আবার এক নূতন মন্দির কেন?

কাশীধামে অসংখ্য দেবমন্দির থাকিতে, কামরূপে কামাখ্যাদেবীর থাকিতে, কালিঘাটে কালীমন্দির থাকিতে আবার নূতন মন্দিরের প্রয়োজন কি? অবশ্য খেয়ালী ধনী লোকে নিজ নিজ ব্যয়ে বাসনানুরূপ মন্দিরাদি গঠন করেন তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু সংস্কার অভাবে দেশের কত মন্দির ভূমিসাৎ হইতেছে; সেবা পূজার অভাবে কত মন্দিরে বিগ্রহের নিগ্রহ হইতেছে; সাত্ত্বিকতার অভাবে কত মন্দিরে ধর্ম্মাচরণের নামে কত পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে; এই সকলের প্রতিকার, এগুলির সংস্কার না করিয়া সাধারণের অর্থে নূতন মন্দির নির্ম্মাণের আবশ্যকতা কি?

আবশ্যকতা আছে। পতনোন্মুখ মন্দিরগুলির সংস্কার, পরিত্যক্ত মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অনাচার অন্যায়ের প্রতিকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও আমরা দেখি নূতনের আবশ্যকতা আছে। পুরাতন একদিন সেই শ্রীপদস্পর্শ পাইয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত আমাদের জন্য সেই পদরেণু মাথায় বহিয়াছে; তাই পুরাতনের সেবা করিয়া আমরা ধন্য। আবার যুগে যুগে নূতন ধাঁজে নূতন সাজে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া সমস্যার নূতন সমাধান করিতে নূতনের মাঝে সেই চিরপুরাতনেরই আবির্ভাব হইয়া

থাকে ; তাই নূতনে আমাদের বড়ই আশা ভরসা। পুরাতন মন্দিরগুলি দেশের মুক্তিসাধনায় এতকাল ধরিয়া যে কার্য্য করিতে সক্ষম হয় নাই এই নূতন মন্দির সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবে ইহাই আশা। শুধু আশা নয় স্বয়ং ভগবান সেইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন ; এবং সেই বাণী বিশ্বাস করিয়া সাধু সজ্জন সফলতার প্রতীক্ষায় জীবনের সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করিয়াছেন।

আদিষ্ট মন্দিরে যে ঈশ্বরদর্শনাদির কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে উহা ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা বা প্রেতসিদ্ধি পিশাচসিদ্ধির কার্য্য নহে। সাত্ত্বিক বৃত্তিনিচয়ের উপযুক্ত যোগাযোগ ভিন্ন ঐরূপ দর্শনাদি সম্ভব নয়। দেশের বর্ত্তমান মন্দিরগুলিতে সেই যোগাযোগ অসম্ভব। সেই মণিকাঞ্চন সংযোগ তিনি নূতন করিয়া ঘটাইবেন। যুগান্তকারী দানবসংহারে নূতন উপাদানেরই প্রয়োজন হয়। ইতিহাস পুরাণাদি ইহার সাক্ষ্য। যেস্থানে প্রতিবৎসর অন্ততঃ তিনজন করিয়া ভাগ্যবান ভগবানের প্রকট দর্শনলাভ করিয়া জীবের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিবে সে অবশ্যই অতি জাগ্রত স্থান হইবে ; সে দেবস্থানের সেবায়েৎ পূজারী হইবে রীতিমত বৈরাগ্যবান সাধক অথবা সাধনসিদ্ধ দ্রষ্টা মহাপুরুষ ; সাধনার উপযোগী স্থান, সৎসঙ্গ, সদালোচনা প্রভৃতি ঈশ্বরসাধনার সমস্ত উপকরণ সেখানে থাকিবে। দেশের বর্ত্তমান মন্দিরগুলিতে এরূপ যোগাযোগ সম্ভব কোথায় ? তাই এই নূতন রচনা ; তাই তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁহারই ভক্ত কর্ম্মী লোকজন দিয়া এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির সূত্রপাত। এই সৃষ্টির সম্ভাবনা আশাতীত ; এই মন্দির সমস্ত মন্দিরের গৌরব বর্দ্ধন করিবে। এই মন্দিরের প্রভাবে মন্দির নামেই লোকে মাথা নত করিবে।

সংস্কার এবং প্রতিকারেরও পথপ্রদর্শক হইবে এই মন্দির। ভাল হইয়া ভাল করাই নিয়ম। সমস্ত সাধনা দিয়া সবার সম্মুখে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাহারই পুণ্যপ্রভাবে বহু সংস্কার ও প্রতিকার

আপনা হইতে হইয়া যায়। সাধুসম্প্রদায়ের দুর্গতিতে দুঃখিত ব্যক্তি ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বক্তৃতা অথবা সাধুবেশীকে সদুপদেশ না দিয়া নিজে যদি প্রকৃত সাধু হইয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সমস্ত সম্প্রদায়ের সংস্কার সহজ হয় না কি? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে দেশের মন্দিরগুলির সার্থকতা সম্পাদন অথবা সংস্কার সাধন করিতে হইলেও এক আদর্শ মন্দির স্থাপন অপরিহার্য্য।

২। মন্দিরের জন্য এত বড় বিরাট আয়োজন কেন?

ঘটে পটে পর্ণকুটীরে দীন হীন দুঃখীর সামান্য আয়োজনে শুদ্ধ প্রাণের আকুল আহ্বানে যে ভগবান প্রকট হইয়া ভক্তের তাপিত প্রাণ শীতল করেন তাঁহার জন্য এত বড় মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা কি ইহাও কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তির বুঝা উচিত যে সাধারণের অগোচরে কোন ভক্তের প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবান কোন আয়োজনের অপেক্ষা না করিলেও যেখানে তিনি আবির্ভূত হইবেন বলিয়া আদেশ জাহির করিয়াছেন সেখানে বিশেষ আয়োজনের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। আজ যদি প্রচার হয় যুবরাজ ভারতে আসিতেছেন অমনি হৈ হৈ লাগিয়া যাইবে। পথে পথে সাজ সজ্জা, গৃহে গৃহে ধ্বজ পতাকা, রাস্তায় ঘাটে তোরণ দ্বার; কত মঞ্চ কত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে টাকা পয়সার ছড়াছড়ি, আয়োজনের হুড়াহুড়ি, এইরূপ আরও কত সমারোহ ব্যাপার লাগিয়া যায়। কি জন্য? একজন রাজপুত্র আসিবেন, তাঁহারই জন্য এই বিরাট সম্বর্দ্ধনা! আর আমাদের এই মন্দিরে আসিবেন রাজার রাজা, দুনিয়ার মালিক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি স্বয়ং! এই মন্দিরের কি বিশেষ আয়োজনের আবশ্যকতা নাই? রত্নাকরের রত্নরাজি পুঞ্জীভূত করিলেও এমন কি ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ হয় যাহা সেই বিশ্বপতির অভিনন্দনের পক্ষে অতিরিক্ত বোধ হইবে? তাহা যখন হয় না তখন

সঙ্ঘের এই যৎসামান্য আয়োজনে কর্ম্মীদিগকে উৎসাহ দেওয়াই ভক্তমাত্রের কর্ত্তব্য নহে কি ?

৩। প্রচার হইতেছে মন্দির হইতেই সব হইবে। মন্দির হইতে স্বরাজ হইবে বলিতে পারেন ?

ঠাকুরের আদেশ প্রচার উদ্দেশ্যে কর্ম্মিগণ স্থানে স্থানে সভা সমিতি আহ্বান করিয়া থাকেন। শ্রীরামপুর বৈদ্যবাটীতে এইরূপ এক সভায় একবার জনৈক দেশপ্রেমিক আদিষ্ট মন্দিরের কথা শুনিতে শুনিতে অধীর হইয়া উপরি উক্ত প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ তিনি সাধারণের মতই বিশ্বাস করেন ধর্ম্মধ্বজী সাধু সন্ন্যাসী আবার স্বরাজের কথা কি বলিবে ? কথা সত্যই ; সাধু সন্ন্যাসী বড় একটা রাজনীতির ধার ধারে না। কিন্তু তাই বলিয়া রাজনীতি কি ধর্ম্মের বহির্ভূত ? জাতীয় মুক্তিসাধনা কি ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ নহে ? ভগবান রামকৃষ্ণের এই আদেশবাণীর মধ্যে আমরা কেবল ভগবৎকৃপার বাণীই ত শুনিতে পাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রগুরু গান্ধীজি পর্য্যন্ত প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন যে একমাত্র ভগবানের কৃপা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই ; শেষ বার কারাবাসে যাইবার পূর্ব্বে সেই বাণীই তিনি দেশবাশীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। স্বগায় অন্নদাঠাকুর মহাশয়ও ভগবৎকৃপায় সেই শুভ সংবাদ দেশকে শুনাইয়াছেন। আমরা তাহারই আবৃত্তি করিতেছি। আমাদের সমস্ত আশাই ভগবৎকৃপায় পর্য্যবসিত। আদেশ আছে বৎসর বৎসর এই মন্দিরে ভাগ্যবান ভক্ত ভগবানের প্রকট দর্শন লাভ করিয়া দেশহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবে। কিসে যে কি হইবে কাহার দ্বারা যে কি কাজ তিনি করাইবেন কে বলিতে পারে ? জন কয়েক যুবক রাজশক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতে কুটীল কুপথ আশ্রয় করিলেও দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক দীর্ঘ জীবনের সমস্ত

সাধনা দিয়া যখন বুঝিয়াছেন যে ভগবৎকৃপাই আমাদের একমাত্র আশার স্থল তখন ভগবৎকৃপার অন্যতম উৎস এই মন্দিরের আশ্রয়ে জাতীয় মুক্তি সাধনার কিছুমাত্র সিদ্ধির আশা নাই একথা মনে করাও একটা মস্ত ভুল নহে কি?

৪। ভগবান রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ জীবিত থাকিতে তাঁহাদের উপর আদেশ না হইয়া অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের উপর আদেশ হয় কেন?

ভগবান রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ জীবিত থাকিতে কেন যে এই আদেশবাণী চট্টগ্রামবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান প্রাপ্ত হইলেন তাহার কারণ ভগবান রামকৃষ্ণই জানেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে মুহূর্ত্তে লাখ লাখ বিবেকানন্দ তৈয়ার হতে পারে; তা না করে যদি তিনি এই নরেন দত্তকে দিয়েই তাঁর কাজ করান ত কে কি করতে পারে?"

সকলই তাঁহার ইচ্ছা। সাধারণ লোকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলেও ভগবান রামকৃষ্ণের পার্ষদ বা তদীয় কৃপাভাজন শিষ্যবৃন্দ বোধহয় এরূপ প্রশ্ন করেন না; কারণ সাধারণ লোকে না জানিলেও তাঁহারা জানেন রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবানের ভক্ত কেবল মঠের চতুঃসীমানার মধ্যেই অথবা ঠাকুরের কাজ শুধু মিশনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। ভগবান সবার সমান; কোথায় তাঁহার কোন ভক্ত বা কোন কর্ম্মী কি ভাবে গঠিত হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে? কাহারও ভক্তাভিমান যদি অতিমাত্রায় জাগিয়া থাকে তিনি যেন নারদের সেই অবস্থার কথা স্মরণ করেন যে অবস্থায় ভগবান তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন যে তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত ভগবানের আছে। প্রকৃত ভক্ত হইলে এতদবস্থায় কৌতূহল হয় দর্শন করিতে এমন সৌভাগ্য কাহার, কেমন সে আধার যাহাতে

আধেয় হইয়া প্রাণের দেবতা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। জড়জগতের নিয়মে সাধারণ মানব গুরু বা পিতার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে চায়; শিষ্য বা পুত্র পিতার কার্য্যক্রম রক্ষা করিতে আশা করে; অন্যের আশা আকাঙ্ক্ষায় সে অনধিকার দোষ আরোপ করিয়া থাকে; কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মে অনেক স্থলেই তদ্বিপরীত লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর সবারই ঈশ্বর। তাঁহার ঘরও নাই পরও নাই; হেয় প্রেয়, ত্যজ্য গ্রাহ্য তাঁহার কিছুই নাই। শিষ্য পোষ্য জগৎগুরুর সর্ব্বস্ব নয়; জগৎগুরুর কৃপাভাজন যে কেহ হইতে পারে। তাঁহার কৃপালাভের আশায় যে কোন ভাগ্যবান সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারিয়াছেন, লজ্জা ঘৃণা ভয় ভুলিয়া যিনিই তাঁহার প্রেমে পাগল হইয়াছেন, সবাই জানে যুগে যুগে ভগবান তাঁহাকেই কৃপা করিয়াছেন। সেই অধিকার, সেই তীব্র বৈরাগ্য কোথায় কি ভাবে কোন শুদ্ধচিত্তকে আশ্রয় করিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? মানবমাত্রেই সে আশার অধিকারী; যিনি যতটুকু শুদ্ধাধার তাঁহার সে আশা ততটুকু ফলবতী হইবে। দ্বেষ হিংসা সে উন্নতির গতিরোধ করিতে পারিবে না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেই সময়ের কথা যখন স্বগায় অন্নদাঠাকুর মহাশয় পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের আশ্রমগুলি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। যেদিন তিনি হেদোর ওখানে বিডনষ্ট্রীটে স্বামী অভেদানন্দজীর আশ্রমে গিয়া উঠিলেন সেদিন আমিও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। আলাপ পরিচয়ের পর দক্ষিণেশ্বরে এই নবীন অনুষ্ঠানের কথায় স্বামীজি ঠাকুরের আদেশ সম্বন্ধে এই প্রশ্নই উত্থাপন করিলেন। ঠাকুরমহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "দেখুন, আপনারা তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য; কত তাঁর কোলে পিঠে চড়েছেন; নিজহাতে কত তিনি আপনাদের খাইয়েছেন; পিঠে হাত বুলিয়ে কত আদেশ কত উপদেশ তিনি আপনাদের শুনিয়েছেন। আর আমরা কি স্বপ্নেও একবার তাঁর দর্শন কি একটা আদেশ পাব না? ঠাকুর ত সবারই ঠাকুর?"

ঠাকুরমহাশয়ের কথায় স্বামী অভেদানন্দজী হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। উভয়ের হাসিতেই প্রসঙ্গের শেষ হইল। স্বামীজি বলিলেন, "বেশ, বেশ, ঠাকুরের কাজ যতই ছড়িয়ে পড়ে ততই ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ইহার পর আর এ প্রশ্নের অধিক আলোচনা প্রয়োজন বোধ করি না।

৫। রামকৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারে আদ্যাপীঠ কি সাহায্য করিতে পারে?

চিকাগোর ধর্ম্মসভায় হিন্দুবীর বিবেকানন্দের বীরবাণী যেদিন নিখিল বিশ্বের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দম্ভ দর্প চূর্ণ করিয়াছিল সমগ্র জগৎ সেদিন বুঝিয়াছিল যে পরাধীন জাতির ধর্ম্ম বলিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে উপেক্ষা করা অর্ব্বাচীনের কার্য্য। হিন্দুস্থানের বাহিরে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের এই সফলতায় হিন্দুস্থানের সাধুসম্প্রদায় চিরগৌরবান্বিত; স্বামীজির নিকট চিরকৃতজ্ঞ। গভীর শ্রদ্ধায় সকলে স্বামীজির বেদান্তধর্ম্ম ও কর্ম্মবাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন, মুগ্ধচিত্তে তৎপ্রবর্ত্তিত সেবাকার্য্যের অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাঁহার কর্ম্ম ও গুণরাশি স্মরণে অভিভূতচিত্তে সামান্য শিথিলতাগুলি উপেক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু শিষ্য প্রশিষ্যগণের আচার ব্যবহারে সামান্য এই শিথিলতাগুলির প্রবল প্রভাব এবং তদীয় গুণাবলীর অত্যন্ত অভাব স্বামীজির আদর্শ খর্ব্ব করিতে বসিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য যাহাদের জীবনের ভিত্তি, যোষিৎসঙ্গ পরিহার করাই যাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান সহায়, আহার বিহারে সাত্ত্বিকতা রক্ষা করাই তাহাদের বিধি। শুদ্ধাহার ও শুদ্ধাচার তাহাদের অবশ্য পালনীয়। শাস্ত্র ও নীতিবিদ স্বামী বিবেকানন্দ তাহা জানিতেন। বাঙ্গালী যুবককে সুস্থ সবল ও কর্ম্মঠ করিবার জন্য স্বামীজি বাঙ্গালীর আহারে

মৎস্য মাংসের ব্যবহার সমর্থন করিলেও যতি ব্রহ্মচারীর জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করেন নাই। সাধারণ কর্ম্মীর জন্য তিনি যে বিধি ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, অসাত্ত্বিকবোধে কোন কোন গৃহী পর্য্যন্ত যাহা বর্জ্জন করেন, সাধু সন্ন্যাসী হইয়া তাহা গ্রহণ করিলে নিন্দনীয় ও ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই হইতে হইবে। যতি ব্রহ্মচারী কর্ম্মী হইলেও, দেহ কর্ম্মঠ রাখিতে চাহিলেও সাত্ত্বিক আহার ও শুদ্ধাচার বজায় রাখা প্রয়োজন। বল বীর্য্য সাত্ত্বিক আহারে যথেষ্ট আছে। তথাপি নবীন সন্ন্যাসীরা যে একথা বুঝিয়াও বুঝেন না তাহার কারণ এই যে আহারাদি সম্বন্ধে স্বামীজি নিজে কোন বিধি নিষেধ মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার পক্ষে উহা ক্ষতিকর না হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণ সাধক আহারাদি সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। শুনিয়াছি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্র নাথকে যে সকল বস্তু খাওয়াইতেন ক্ষতির আশঙ্কায় অন্যান্য সাধারণকে তাহা খাইতে দিতেন না। ইহা জানিয়াও যদি আমরা স্বামীজির আদর্শের মধ্যে চা চুরুট অখাদ্য কুখাদ্যগুলিই আগে গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদের এই ভ্রান্তির জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অসন্তুষ্ট হইবেন না কি?

শিক্ষার্থী সাধকের পক্ষে আহারাদি সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া নীতি-বিগর্হিত। তাই আধুনিক নবীন সন্ন্যাসীদিগের আচার বিচার দেখিয়া বাংলার নীতিবিদ আক্ষেপ করিয়াছেন—

কে গাবে নূতন গীতা?
কে ঘুচাবে এই সুখসন্ন্যাস গেরুয়ার বিলাসিতা? ইত্যাদি।

বাংলার বাহিরে মৎস্যাশী বলিয়া চিরকাল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরও অনাদর; তাহার উপর সাধু সন্ন্যাসী হইয়াও অখাদ্য কুখাদ্য গ্রহণের জন্য সমস্ত সাধুসম্প্রদায় রামকৃষ্ণ শিষ্যপ্রশিষ্যগণের নিন্দা করেন। সুদূর কাশ্মীরে পর্য্যন্ত সারদা মঠের আচার্য্যের মুখে এই নিন্দাবাদ শুনিতে হইয়াছে। তাঁহার সহিত আলোচনায় আহারাদি সম্বন্ধে স্বামীজির রীতিনীতি যখন

আমি সমর্থন করিতেছিলাম মঠাধ্যক্ষ তখন বলিয়াছিলেন, আচার্য্যকে মনে রাখিতে হয় যে অনুচরগণ আচার্য্যের সাধনা অনুসরণ করিতে না পারিলেও তাঁহার শিথিলতা অনুকরণ করিতে সুদক্ষ হইয়া উঠে। একথার পর আর আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত যুক্তি না পাইয়া আমি নীরব রহিলাম।

পান ভোজনের সহিত ঈশ্বরদর্শনাদির কোন সম্বন্ধ থাক বা না থাক সাধনার সহিত সাত্ত্বিকতার সম্বন্ধ আছে। ভগবান রামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথে যে আচার বিচার বর্জ্জন করিতেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, আদ্যাপীঠের কার্য্য এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করাইবে। আদ্যাপীঠের রীতিনীতি প্রত্যক্ষ করিয়া জনসাধারণ বুঝিবে যে ভগবান রামকৃষ্ণের সৃষ্টিতে রাজসিকতা প্রকাশ থাকিলেও সাত্ত্বিকতার বিকাশে বিলম্ব নাই। প্রথম পর্য্যায়ে ভক্তিভাবের অনুশীলন না দেখিয়া যে সকল রামকৃষ্ণভক্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, দেবতার ভোগে মৎস্য মাংস নিবেদন করিতে দেখিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন, আদ্যাপীঠের ভাবভক্তি পূজা পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহারা বুঝিবেন রামকৃষ্ণ শুধু শাক্ত ছিলেন না; তিনি বৈষ্ণবও ছিলেন; এবং আরও কত কি ছিলেন তাহা হয় ত আমরা সম্যক্ বুঝি না। আদ্যাপীঠের সেবা পূজা সমস্তই সাত্ত্বিক ধরণের; এখানে পশুবলি নাই; এখানে দেবতার ভোগের ও আশ্রমবাসীদিগের সেবার সমস্ত নিরামিষ ব্যবস্থা। আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অন্নদাঠাকুর মহাশয় আশ্রমে কোনরূপ তামসিকতার প্রশ্রয় দিয়া যান নাই। আদ্যাপীঠের এই সাত্ত্বিক আচার ব্যবহার দ্বারা ভগবান রামকৃষ্ণ তাহার অপূর্ণ সৃষ্টি পূর্ণ করিতেছেন।

আলোচ্য প্রশ্ন সম্বন্ধে অবশিষ্ট আলোচনা "অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব" নামক অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কয়েকটী মন্তব্য

ভগবানের আদেশবাণী প্রচার উদ্দেশ্যে বিগত ২৬।৫।৩৯ তারিখে ভবানীপুর পদ্মপুকুর ইনষ্টিটিউশন হলে যে সাধারণ সভা আহুত হইয়াছিল তাহার সভাপতিরূপে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, মহোদয় নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন—

আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে এখানকার একটা বৈশিষ্ট্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়; সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর প্রাচুর্য্য। আমাদের দেশ যেন সাধুসন্ন্যাসীর দেশ; অন্য কোন দেশেই এত সাধু সন্ন্যাসী দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। হরিদ্বার, লছমনঝোলা গিয়ে সাধু দর্শন কর্‌বার সৌভাগ্য হয়েছিল; কুম্ভমেলাতেও সাধু দর্শন করেছি। এঁদের সংস্পর্শে এসে আমার এই ধারণা হয়েছে আমাদের দেশের মত দেশ আর নেই। 'আমাদের দেশের মত দেশ আর নেই' এটা মানুষের স্বাভাবিক স্বদেশপ্রেমজাত উক্তি। আমি সে ভাব দিয়ে বল্‌ছি না। আপনারা একটু বিচার করে দেখুন দেখি, হিমালয়ের মত এমন পর্ব্বতমালা, গঙ্গা যমুনা সিন্ধু গোদাবরীর মত এমন পুণ্যতোয়া নদনদী, রামায়ণ মহাভারতের মত এখন চরিতগাথা, ব্যাস বাল্মিকী বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মত এমন মুনি ঋষি আর কোন দেশে আছে কি? দেশের মহিমাকীর্ত্তন শোনবার মত ধৈর্য্য হয় ত অনেকের নেই; কিন্তু বিচার করে দেখুন, আমাদের দেশের এই সব অবতারকল্প মহাপুরুষদের আবির্ভাব—এটা কি একটা আশ্চর্য্য জিনিষ নয়? আদিযুগের কথা ছেড়ে দিন। চারশ বৎসর আগে এই যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব—সাধারণ এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি যে প্রেমের বান ডাকিয়ে গেলেন, জীবকে নামামৃত বিলিয়ে গেলেন, এটা কি একটা আশ্চর্য্য জিনিষ নয়? তার পর আবার এই সেদিনকার কথা, যাঁর নামে এই ব্রহ্মচারীদল এখানে সমবেত হয়েছেন, সেই রামকৃষ্ণ-

দেবের আবির্ভাব ; সেটা কি একটা আশ্চার্য্য জিনিষ নয় ? দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম, নাই বিদ্যা নাই শিক্ষা ; কিন্তু কেমন ভাবে তিনি অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হলেন ; এই স্বর্গীয় অন্নদাঠাকুরও সেইরূপ একজন মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষকে হয় ত একাধিকবার দর্শন করেছিলাম ; কিন্তু বিশেষভাবে একবারের কথা আমার মনে পড়ে। সেদিন বাংলার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া গণেশদাস গোষ্ঠলীলা কীর্ত্তন কর্‌ছিলেন। তার একটু আভাষ দিই ; ব্রজের সেই রাখালবালকগণ সেদিন নন্দের দ্বারে নব লক্ষ গাভী সহ প্রাণ কানাইএর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান—গাভীগণ নয়নজলে ও স্তনক্ষীরে কৃষ্ণকে আহ্বান কর্‌ছেন—এদিকে নন্দরাণী রামকৃষ্ণকে সাজিয়ে বিদায় দেবার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে রক্ষাকবচ পাঠ কর্‌ছেন এই অবস্থা বর্ণনা হচ্ছে। এমন সময় দেখি একজন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠ্‌ছেন ; প্রথমে মনে হল বুঝি চলে যাবেন ; পরে দেখ্‌লাম, তা নয়। মাত্র দুটী পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়ে প্রায় এক ঘণ্টাকাল দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর উজ্জ্বল চোখের চাহনি কোন সুদূর দৃশ্যে নিবিষ্টভাবে নিবদ্ধ ; দর দর ধারে অশ্রু ঝর্‌ছে ; জনৈক দেহরক্ষী তাঁর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ; কখন যে অবশ দেহ ভূলুণ্ঠিত হয় কিছুই স্থিরতা নেই ; ক্রমে তাই হল ; পতনোন্মুখ সেই মূর্ত্তি কয়জনে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন। তাঁর সেই স্বর্গীয় ভাব দেখে মনে হয়েছিল কীর্ত্তনের রসে তাঁর দেহ মন প্রাণ যেন সরস হয়ে উঠেছে। আমরাও কীর্ত্তনের রসাস্বাদন করি ; কিন্তু সে রসনা পর্য্যন্ত ; তাতে কণ্ঠও সরস হয় না। শুনেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত্তের জন্য ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছিলেন। আর আমি স্বচক্ষে যা দেখ্‌লুম তাতে মনে হল এই মহাপুরুষ এতক্ষণ ধরেই সেই আনন্দ—আপনারা ব্রহ্মানন্দ বল্‌তে চান তাই বলুন—লাভ কর্‌লেন। অবতার আর কাকে বলে ? তাঁর শিষ্য সেবকগণ এ পর্য্যন্ত তাঁকে অবতার বলে প্রচার করেন্ নি ; তাঁর সাধুতার কথাই তাঁরা বলেন।

ভগবান্ বলেছেন সাধুরা আমার প্রাণ ; আমি সাধুদের প্রাণ। বাস্তবিক সাধুদের হৃদয়েই ভগবানের আসন ; সাধুদের আগমনে ভগবানের আবির্ভাব। শাস্ত্রে আছে অতীর্থ স্থান সাধুদের আগমনে তীর্থে পরিণত হয়। এই সাধুরাই ভারতের প্রাণ। আপনারা এই একটু আগে যেমন দেখ্‌লেন একটী লোক আকর্ষী দ্বারা স্থইচ টেনে সব আলো জ্বেলে দিয়ে গেল, এই সাধু সন্ন্যাসীরা সেই রকম মানব হৃদয় আলোকিত কর্‌বার আকর্ষী ও স্থইচের সন্ধান জানেন। তাই তাঁরা মধ্যে মধ্যে আমাদের কাছে এসে আমাদের অন্ধকারময় জীবনকে আলোকিত করেন। আজ সন্ধ্যায় এই যে সাধুরা এই সভার আয়োজন করেছেন এর উদ্দেশ্য এ নয় যে মন্দিরের কথা বলে সভার শেষে ফটকে দাঁড়িয়ে লম্বা এক চাঁদার খাতা খুলে বা আপনাদের পিছু পিছু গিয়ে কিছু কিছু আদায় করে নেওয়া। দুচার টাকা চাঁদার কাজ এ নয়। এ সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের সকলকে শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুরের কার্য্যাবলী পরিদর্শন কর্‌বার জন্য আহ্বান করা। আদ্যাপীঠকে উপলক্ষ্য করে কি ভাবে ৺আদ্যাশক্তির করুণাধারা দেশবাসীর উপর বর্ষিত হচ্ছে, কি ভাবে বালকবালিকাদের আশ্রমগুলির দ্বারা দেশের দশের মঙ্গলায়োজন করা হচ্ছে এই সব পর্য্যবেক্ষণ করুন ; তৃপ্ত হবেন। আমিও এঁদের আহ্বানে আশ্রমাদি পরিদর্শন করে পরম প্রীতি লাভ করে এসেছি। আপনারাও সেই আনন্দলাভ কর্‌বেন ; তখন আপনা হতেই বহু দাতা ভক্তের আবির্ভাব হবে ; আপনা হতেই এই সব অনুষ্ঠান গড়ে উঠ্‌বে। ঠাকুর মহাশয়ের অনুষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করে আমি দেখেছি সত্যই তাঁর ভক্ত কর্ম্মীরা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ কর্‌ছেন। চিরদিনই সাধু সন্ন্যাসীরা আমাদের পাপের ভার লাঘব করে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রেখেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর সাধনাতেই আমাদের বহুদিনের সঞ্চিত পাপরাশি নষ্ট হয়ে যায়। পতনশীল আচ্ছাদনের এই স্তম্ভগুলি যেমন এই গৃহ রক্ষার মূলীভূত কারণ,

সাধুরাও তেমনি আমাদের দুষ্কর্ম্মে ধ্বংসোন্মুখ সমাজ রক্ষার মূলীভূত কারণ। দেশহিতে রত সাধুসঙ্ঘগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনই দেশের বৃহত্তম অনুষ্ঠান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই আস্থাপীঠ থেকেও কালে রামকৃষ্ণ মিশনের মত বহুসংখ্যক দেশসেবকের আবির্ভাব হবে।

* * * * *

পূর্ব্বোক্ত সভায় পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন বেদশাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—

সে আজ দশ বৎসরের কথা যখন ৺অন্নদাঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক কোণে; এর পূর্ব্বেই আমাদের পরস্পর জানাশুনা ছিল; কারণ তাঁর সঙ্গে আমার একটু রক্তের সম্বন্ধও আছে; তা ছাড়া এক গ্রামেই বাড়ী। সে যাহোক এই সময় থেকেই তিনি আমাকে তাঁর সহকর্ম্মীরূপে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। মনে আছে সে দিনের কথা; কোন কাজ কর্ম্ম নেই, নানা দুশ্চিন্তায় মগ্ন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে রাজা হৃষীকেশ লাহার বাড়ীর সেই কোণে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দেখি গেরুয়াপরা অন্নদা আস্‌ছে। আমি তাকে অন্নদা বলেই ডাক্‌তাম; সে আমায় দাদা বল্‌ত। দেখা হলে যখন বল্‌লুম আমার কাজ কর্ম্ম কিছু নেই। সে বল্‌লে "আসুন,অনেক কাজ আপনাকে কর্‌তে হবে।" তখন এই সঙ্ঘের ভিত্তিস্থাপন মাত্র হয়েছে। সেই সময় থেকেই আমি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; অথচ অন্নদার এক পথ, আমার আর এক পথ; সে সাকারবাদী, আমি নিরাকারে বিশ্বাসী; কিন্তু তার সঙ্গে আমার যে ভালবাসা তা কোন দিন কমে নাই। এই সঙ্ঘে ঢুকে এদের কাজ কর্ম্ম প্রত্যক্ষ করে আমি দেখেছি এদের মন্দিরের কল্পনায় সত্যই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব বিদ্যমান। এদের মন্দিরের যে চূড়া দেওয়া হয়েছে তাতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকল ধর্ম্ম মতাবলম্বীদের প্রতীক সম্মান লাভ

করেছে। সত্যই এই মন্দির এক মহামিলনের ভিত্তি। গীতাতেও ভগবান বলেছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও বলেছিলেন "যত মত তত পথ"। তিনি সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন। এ ভাবটী আমি অন্নদার মধ্যে পেয়েছি। আর আজ এই দশ বৎসরের মেলামেশার ফলে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি—অন্নদাঠাকুর প্রতারক নন। লোক ঠকিয়ে বড় হবার চেষ্টা তার ছিল না। কীর্ত্তনাদিতে, ভগবৎপ্রসঙ্গে, তার যে অবস্থা—যে সমাহিত ভাব লক্ষ্য করেছি তা সাধারণ মানবে সম্ভব নয়। কোন প্রতারক চেষ্টা করে সে ভাব আনতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ দেখেছি তাঁর কষ্টস্বীকার। সারাজীবন কখনও ভাল আহারের বন্দোবস্ত করতে দেখিনি ; সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁর জীবন কেটেছে ; ভোগবিলাসের সুবিধা ঘটলেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে বরাবরই তিনি আড়ম্বরশূন্য ছিলেন।

তৃতীয়তঃ দেখেছি তিনি কোনদিন গুরুগিরি করেন নি ; শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাহিলেও তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না।

চতুর্থ বিষয় যা লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে এই যে এমন নিঃস্বার্থভাবে শুধু পরের মঙ্গলের জন্য কেউ কোন দিন কোন মন্দিরের কল্পনা করেন নি। আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে অনেক ধর্ম্মমন্দির আছে ; কিন্তু কোথাও এমন নিঃস্বার্থভাব পরিলক্ষিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ৺তারকেশ্বরের মন্দিরের কথা ভাবুন ; সেখানে মোহন্ত আছেন, তাঁর সম্পত্তি আছে। কিন্তু এখানে সেরূপ কিছু নেই ; বরং আদ্যাপীঠের সঙ্গে মিশে আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে এখানে আছে সত্য, এখানে আছে চরিত্র এখানে আছে পরের মঙ্গলসাধনের জন্য এক প্রবল চেষ্টা। সত্যই এ এক ধর্ম্মের লীলাভূমি।

তারপর অন্নদাঠাকুরের এই স্বপ্নাদেশের কথা। স্বপ্নে বস্তুলাভ হিন্দুর কাছে নূতন জিনিষ নয়। স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া যায়; স্বপ্নে দেবদর্শন হয়; স্বপ্নে ঔষধ লাভ করা যায়, ভবিষ্যৎ জান্‌তে পারা যায়; এসব আমাদের দেশে কোন নূতন কথা বা আশ্চর্য্য কথা নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য আমার কাছে এই লাগে যে এই পাথুরে প্রমাণের যুগে একদল কৌপীনসম্বল গেরুয়াপরা সাধু এক অদ্ভুত তত্ত্ব দেশবাশীর কাছে অসঙ্কোচে বলে বেড়াচ্ছে। এদের ঐকান্তিকতা, এদের নিষ্ঠা, এদের ত্যাগ তিতিক্ষা সত্যই একটা ভাব্‌বার কথা; পেটের দায়ে সাধু সাজ্‌বার মত এদের মধ্যে কেউ নেই। এই আনন্দতাই এক দিন এক শ টাকা বেতনের চাকরী ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজেছেন, এই জ্ঞানভাইও ভাল চাকরীতে জবাব দিয়ে ঠাকুরের কাজে যোগ দিয়েছেন। এই সব লোক ঐদিকে থাক্‌লে এতদিনে দেড়শ টাকা মাসে উপার্জ্জন কর্‌তেন সে সব ছেড়ে এঁরা অন্নদাঠাকুরের সঙ্গ নিয়েছেন। এই সব দেখে শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে অন্নদাঠাকুরের এই মন্দির হবেই হবে।

মন্দির যে হবে তার আর এক প্রমাণ এই যে, অন্নদাঠাকুর যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনে এই কাজ যতটুকু প্রসারলাভ না করেছিল আজ তার চেয়ে বেশী বেড়েছে। অনেক মহাপুরুষ কাজ আরম্ভ করেন খুব বড় করে, কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সব বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এখানে দেখ্‌ছি ঠিক তার বিপরীত। ঠাকুরের দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বড় বড় উপাধিধারী খ্যাতনামা লোক ছিলেন, যে সমস্ত অবিশ্বাসী অর্দ্ধবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা সব চলে গেলেন। আর যারা সে সময় নিতান্ত নাবালকের মত তাঁর কথামত চল্‌তেন সেই কৌপীনসম্বল ব্রহ্মচারী ভায়েরাই এই কর্ম্মের ভার নিয়ে তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কাজ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলেছেন। আমার মনে আছে ঠাকুরের দেহত্যাগের বৎসরখানেক পর যেদিন প্রথম এঁদের আমন্ত্রণে আদ্যাপীঠে

যাই সেই বাৎসরিক উৎসবের দিন দেখি শতে সহস্রে কাতারে কাতারে লোক রাস্তার উপর দিয়ে চলেছে। সকলেই আদ্যাপীঠে চলেছে। আদ্যাপীঠে যাচ্ছে কি দেখতে? কতকগুলি ভগ্ন শিবমন্দির আর ত্রিমূর্ত্তি সাজান একখানি ঘর! এর মধ্যে দেখবার এমন কি আছে যে এত লোক সেখানে যাচ্ছে! কার আকর্ষণে এত লোক ছুটে চলেছে? মনে হল যে সত্যই এর মধ্যে এক দৈবশক্তি বিরাজমান; অনুমান করলাম যে এক অদৃশ্য হস্ত এই অনুষ্ঠান পরিচালিত করছে। আমি স্তম্ভিত ভীত ও স্তব্ধ হয়ে দেখলাম এর মধ্যে বুঝবার কিছুই নেই। বুদ্ধদেব যখন হংসারূঢ় ব্রহ্মাকে দেখতে পেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, এই ধর্ম্ম "দুর্দ্ধর্ষো গম্ভীরো সহজো পণ্ডিতবেদনী।" দেখলাম এদের কার্য্যও সেইরূপ; ধীর স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করলে এই অন্নদাঠাকুর বা তাঁর আদিষ্ট কর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারা যায়। প্রত্যক্ষ করেছি তিনি যে স্তরে গিয়েছিলেন মানুষে তা সাধনা করে লাভ করতে পারে না। তবে কে পারে? সেই পারে যাকে তিনি বরণ করেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্॥

বহু অধ্যয়নে তাঁকে পাওয়া যায় না; অনেক গ্রন্থার্থধারণ করলে তাঁকে পাওয়া যায় না; বহু শাস্ত্র শ্রবণ করলেও তাঁকে পাওয়া যায় না; তিনি যাকে বরণ করেন সেই তাঁকে পায়। অন্নদাঠাকুরকে দেখেও তাই মনে হয়েছিল যে সত্যই ভগবান যেন তাঁর প্রতি প্রীত হয়ে নিজেই তাঁকে বরণ করেছেন।

বিগত ১৯।৩।৩৯ তারিখে কলিকাতা এলবার্ট হলে আহুত বিরাট ধর্ম্মসভায় সভাপতি স্যর দেবপ্রসাদ সার্ব্বাধিকারী মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ—

স্বর্গীয় অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁকে দর্শন করেই আমি বুঝেছিলুম সত্যই তিনি একজন ভগবদনুগৃহীত মহাপুরুষ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে সামান্য কবিরাজের মত জীবনযাত্রা সুরু কর্‌তে গিয়ে কেমন করে তিনি ভগবান রামকৃষ্ণের কৃপায় সাধন দুর্লভ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা আপনারা সবাই শুনেছেন। আমি এই ব্রহ্মচারীদের অনুরোধে এবং নিজের আকাঙ্খায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরে এই নূতন অনুষ্ঠান দর্শন করে এসেছি। সেখানে আদ্যাপীঠে দেবালয়ের শোভা, সেবা পূজার বিধি ব্যবস্থা, সাধু সন্ন্যাসী কর্ম্মীদের কার্য্যপদ্ধতি সমস্ত পরিদর্শন করে চমৎকৃত হয়েছি। সেখানে ছেলেদের একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও দর্শন করে আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি। সেই সব বালক বালিকারা আজে এখানে উপস্থিত। আপনাদের সকলের দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁদের দর্শন করবার সময় ও সুবিধা নেই জেনে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে আনন্দ দেবার জন্য এঁরা এই সব আশ্রম কুমার কুমারীদের আজ এখানে আনিয়েছেন; আপনারা সকলে তাঁদের মুখে স্তবপাঠ শুনেছেন। আশ্রমের এই সব ছেলে মেয়েদের দৈনিক কার্য্যপদ্ধতি, তাদের রীতিনীতি আচারব্যবহার, ও শিক্ষার ধারা প্রত্যক্ষ করে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে এই সব শিক্ষাশ্রম দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। আমাদের দেশে এই দেশসেবার ভাব থিওসফিষ্টরা ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় প্রথম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য প্রশিষ্যদের দ্বারাই এই সেবার ভাব কার্য্যকরীভাবে দেশে বিস্তারলাভ করে। স্বর্গীয় অন্নদাঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত এই আদ্যাপীঠ থেকেও

প্রকৃত দেশসেবকের উদ্ভব হবে সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই। আদ্যাপীঠের এই সব কর্ম্মীদের নিষ্ঠাভক্তি, তাদের ত্যাগতিতিক্ষা, ও সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সাধনে তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প লক্ষ্য করে আমার ধারণা হয়েছে যে আদেশের মধ্যে যত বড় দুরূহ কার্য্যের ভারই থাক না কেন এদের কাছে সে কাজ মোটেই অসম্ভব নয়। আদেশ আছে এক বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে; মন্দিরের কথা আপনারা যা শুন্‌লেন তাতে বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন সে এক বিরাট ব্যাপার। আজকাল যে রকম দুর্দ্দিন পড়েছে তাতে এত টাকার কাজ ভিক্ষার দ্বারা নির্ব্বাহ করা একরূপ অসম্ভব বলেই আমরা সাধারণতঃ মনে করে থাকি। কিন্তু এই সব কর্ম্মীদের উৎসাহ উদ্যম লক্ষ্য করে আমি বুঝিতে পেরেছি এঁরা সেই "তালাও বনায়েঙ্গে" ফকিরের দল। সে গল্পটাও একটু আপনাদের বলে নি। সে এক ফকির মরুভূমির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। কোন দিকে জলের কোন সন্ধান না পেয়ে তিনি বসে বসে নখ দিয়ে বালি খুড়ে গর্ত্ত কর্‌তে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও ২।১ জন পথিক এসে জুট্‌ল; ফকিরের কাণ্ড দেখে তারা জিজ্ঞাসা কর্‌লে 'ব্যাপার : কি?' ফকির বল্‌লে 'তালাও বনায়েঙ্গে।' ফকিরের এই চেষ্টা অসম্ভব বুছে কেউ হাস্‌ল কেউ চলে গেল আবার কেউ বা সেই ফকিরের সঙ্গে বালি খুড়্‌তে লেগে গেল। ক্রমে আরও লোক এসে যোগ দিলে। এই রকম করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সত্যই একদিন সেই ফকিরের সঙ্কল্প সফল করে সেই মরুভূমির মধ্যে জলাশয় দেখা দিল। আমিও সেই রকম দেখ্‌তে পাচ্ছি এই মন্দিরও একদিন হবেই হবে। এই সব কর্ম্মীদের নিষ্ঠা ধৈর্য্য ও সঙ্কল্প কখনও নিষ্ফল হবার নয়।

তাছাড়া এই মন্দির পরিকল্পনায় কতকগুলি বিষয় আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। তার মধ্যে প্রথম জিনিষ এই ব্রহ্মচারীভাই যা বল্‌লেন—এঁদের এই অসাম্প্রদায়িক ভাব। আদ্যাপীঠের ভাবে শাক্ত

বৈষ্ণবাদি সকলেরই সমাদর করা হয়েছে। তারপর মন্দিরে যে ত্রিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার কথা আপনারা শুন্‌লেন তার মধ্যে প্রণব মধ্যস্থ যুগল মূর্ত্তিকে সর্ব্বোচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে। এটা খুব ঠিক হয়েছে। সত্যই এই বৈষ্ণব ভাব বা প্রেমধর্ম্মই সভ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। তা ছাড়া তত্ত্বের দিক দিয়েও এদের মন্দিরের এই রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি সম্বন্ধে একটা ভাব্‌বার কথা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে এই যুগলমূর্ত্তি বার বৎসরের ছেলে মেয়ের মত আকৃতিবিশিষ্ঠ হবে। এই কিশোর গোবিন্দের ভাবই প্রকৃত বৈষ্ণবভাব। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি দেশব্যাপী শ্লেষের একমাত্র সদুত্তর এই কিশোর গোবিন্দের ভাব। জেনেভার সভাতেও আমি এই কথা বলেছিলুম। সে যাই হোক আপনাদের অনেকক্ষণ এখানে আট্‌কে রেখেছি। আর বেশীক্ষণ আপনাদের সময় নষ্ট কর্‌তে চাই না। আপনারা সকলে আশ্রমপীঠে গিয়ে নিজেরা এঁদের কার্য্যকলাপ দেখুন আর যথাসাধ্য এই সব কর্ম্মীদের সাহায্য করুন। কারণ স্বপ্নের সে মন্দির যদি নাও হয় তাহলেও এঁরা যে সব অনুষ্ঠান চালাচ্ছেন সেগুলি রক্ষার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য যথাসাধ্য তাঁদের সাহায্য করা; কেন না শুধু এই শিক্ষাশ্রমগুলি দ্বারাই দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমাপ্ত

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা—

শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর প্রণীত পুস্তকাবলী

১। স্বপ্নজীবন

শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুরের আত্মজীবনী।

প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ২৲ ইহাতে জীবনীর সত্যসন্ধান, উপন্যাসের মাধুর্য্য, ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশ ও ভক্তের সহিত ভগবানের অপূর্ব্ব লীলার আস্বাদ পাইয়া তৃপ্ত হইবেন।

২। রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা

চতুর্থ সংস্করণ; সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲

প্রায় যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে উচ্চ প্রশংসিত শ্রীশ্রী৺অন্নদাঠাকুর কর্ত্তৃক অলৌকিক ভাবে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতময়ী উপদেশবাণী।

৩। মা

মূল্য দশ আনা

সাধকের মধুর মাতৃভাবের এবং জগৎগুরু রামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে গুরুভাবের করুণ উচ্ছ্বাস।

৪। সখা

মূল্য বার আনা

অতি অপূর্ব্ব ভাবে রঞ্জিত সখ্যভাবের সুললিত সঙ্গীতগুচ্ছ



বালিকাশ্রম ভবন

ব্রহ্মচারিগণ ইতিপূর্ব্বে ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করিয়া আদ্যাপীঠে চলিয়া আসায় ছাত্রাবাসে তাহাদের প্রবেশপথ বন্ধ হইয়াছে। এইভাবে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিলে ঠাকুরমহাশয় নিম্নলিখিত নিবেদন সাধারণে প্রচার করিয়া আশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকগণের গোচর করেন।—

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক ও জনসাধারণের প্রতি শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুরের নিবেদন

সকলেই অবগত আছেন ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদেশে এক অপূর্ব্ব মন্দির স্থাপন, বালকবালিকাদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গত কয় বৎসর যাবৎ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে দেশের বহু লোক মুষ্টি-ভিক্ষা হইতে মাসিক অর্থসাহায্য প্রভৃতি দ্বারা এই সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। জগজ্জননী আদ্যাশক্তির ইচ্ছায় সঙ্ঘের কর্ম্মও আশানুরূপ অগ্রসর হইয়াছে ; এ হেন সময়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই প্রথম এক পরীক্ষা উপস্থিত। প্রায় বৎসরেক কাল অতীত হইতে চলিল আমি 'প্লুরিসি' রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় আছি। আমার রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই পরীক্ষা সঙ্ঘের কর্ম্মে বিশৃঙ্খলারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমার সুস্থ অবস্থায় সঙ্ঘের কমিটি (কার্য্যকরী সমিতি) বরাবর আমারই আদর্শের পোষকতা করিয়াছে ; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আমার রোগ সাংঘাতিক